

## প্রথম অধ্যায়

### কৃষি প্রযুক্তি

কৃষিকাজ এবং কৃষি প্রযুক্তি একে অপরের পরিপূরক। মূলত যে প্রক্রিয়ায় কৃষি কাজ করা হয় তাই হচ্ছে কৃষি প্রযুক্তি। প্রতিটি কৃষিকাজের সাথে সুনির্দিষ্ট কৃষি প্রযুক্তির সম্পর্ক রয়েছে। বর্তমানে কৃষি আর শুধু পারিবারিক খাদ্য সংস্থানের বিষয় নয়। এটা এখন ব্যবসায়িক পেশায় উন্নীত হয়েছে। আগে কৃষি বলতে জমি হাল-চাষ করে বীজ বুনে ঘরে ফসল তুলে বছরের খোরাক সংগ্রহ করাকেই বোঝাত। কিন্তু এখন কৃষির প্রতিটি কাজে প্রযুক্তি ব্যবহারের খরচাদি ও ফসলের বাজারমূল্যের মাপকাঠিতে আয়-ব্যয়ের হিসাবনিকাশ করে ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃষিকে মূল্যায়ন করা হয়। তাই এখন কৃষি সমস্যা যেমন জটিলতর হচ্ছে তেমনি কৃষি বিজ্ঞানীরাও উচ্চতর জ্ঞানসমৃদ্ধ কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছেন। পূর্বের শ্রেণিগুলোতে আমরা কৃষিকাজের নাম, সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির নাম, কৃষি যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়াদি শিখেছি। নবম-দশম শ্রেণিতে আরও এক ধাপ এগিয়ে জমির প্রস্তুতি, উর্বরতা বৃদ্ধি, ফসলভিত্তিক মাটির বৈশিষ্ট্য, ভূমিক্ষয়, ভূমিক্ষয়রোধ, বীজ সংরক্ষণ, রোগবালাই দমন, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ইত্যাদি বিষয় এবং সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি সম্পর্কে জানব।



এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- মাটি ও পরিবেশের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ফসল নির্বাচন করতে পারব;
- ধাপ উল্লেখপূর্বক জমির প্রস্তুত পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব;
- জমি প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারব;
- ভূমিক্ষয়, ভূমিক্ষয়ের কারণ ও প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারব;

- ভূমিক্ষয়ের ক্ষতিকারক দিকগুলো বর্ণনা করতে পারব;
- ভূমিক্ষয়ের কার্যকরী উপায়সমূহ বিশ্লেষণ করতে পারব;
- বীজ সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করতে পারব;
- বীজ সংরক্ষণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- শস্যবীজ সংরক্ষণ করতে পারব;
- মাছ ও পশুপাখির খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মাছ ও পশুপাখির খাদ্য সংরক্ষণের ধাপগুলো বর্ণনা করতে পারব;
- সম্পূরক খাদ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মাছের ও পশুপাখির সম্পূরক খাদ্য তালিকা তৈরি করতে পারব;
- মাছ ও পশুপাখির সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব;
- মাছ ও পশুপাখির দ্রুত বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির জন্য সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারব।

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### ফসল নির্বাচন

#### মাটি ও পরিবেশের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ফসল নির্বাচন

মাটি ফসল উৎপাদনের অন্যতম মাধ্যম। ফসল উৎপাদন মাটির বৈশিষ্ট্যের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। মাটিই হচ্ছে পানি ও পুষ্টির প্রাকৃতিক উৎস। সব মাটিতে সব ফসল জন্মায় না। যেমন: ধানগাছ কাদা মাটি বা কাদা দোআঁশ মাটিতে ভালো জন্মে করে। অপরদিকে চিনা বাদাম বেলে বা বেলে-দোআঁশ মাটি পছন্দ করে। তবে বাংলাদেশের মাটি পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার পলি দ্বারা সৃষ্টি হওয়ার কারণে সব ধরনের ফসলই কমবেশি জন্মায়। বাংলাদেশের অধিকাংশ মাটিই নরম, হালকা, ধূলিময় ও কর্ষণযোগ্য। মাটি বলতে তাকেই বোঝায়, যেখানে ফসল জন্মায়, বন সৃষ্টি হয় আর গবাদিপশু বিচরণ করে। একজন কৃষককে যখন মাটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় তিনি ঝটপট বলে থাকেন যে ভূ-ত্বকের গভীরে যতটুকু লাঙলের ফলা পৌঁছে, যা ফসল উৎপাদনের উপযোগী তাই মাটি। অর্থাৎ কৃষকের ভাষায় ভূ-পৃষ্ঠের ১৫-১৮ সে.মি. গভীর স্তরকে মাটি বলা হয়। অতএব, ফসল উপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য এ স্তরেই নিহিত।

আগেই বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের মাটিতে অল্প বিস্তর সব ফসলই জন্মে। কিন্তু সব অঞ্চলের মাটির বৈশিষ্ট্য একরূপ নয়। তাই দেখা যায়, কোথাও ধান, কোথাও গম, কোথাও আলু আবার কোথাও পাট ভালো হয়। নিচে বিভিন্ন ফসল উপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো।

ধান চাষোপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য	গম চাষোপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য
<ol style="list-style-type: none"> <li>১) কংকর ও বেলেমাটি ছাড়া সব মাটিই ধান চাষের উপযোগী। এঁটেল ও এঁটেল দোআঁশ মাটি ধান চাষের জন্য খুব ভালো। নদ-নদীর অববাহিকা ও হাওর-বাঁওড় এলাকা যেখানে পলি জমে সেখানেও ধান ভালো হয়।</li> <li>২) প্রকারভেদে উঁচু, মাঝারি, নিচু সব ধরনের জমিতেই ধানের চাষ করা যায়। যেমন, নিচু জমিতে বোরো ও জলি আমন চাষ করা হয়।</li> <li>৩) মাটির অম্লাত্বক থেকে নিরপেক্ষ অবস্থা ধান চাষের অনুকূল।</li> <li>৪) মাটিতে জৈব পদার্থ কম হলে কমপোস্ট ব্যবহার করে এর মাত্রা বাড়ানো যায়।</li> <li>৫) মাটির নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ, জিঙ্ক, সালফার ইত্যাদির মাত্রা নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় সার ব্যবহার করে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করা যায়।</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>১) উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি গম চাষের জন্য উপযোগী। মাঝারি নিচু জমিতেও গম চাষ করা হয়।</li> <li>২) দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটি গম চাষের জন্য ভালো। এঁটেল - দোআঁশ মাটিতেও গমের চাষ হয়।</li> <li>৩) বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে গমের চাষ ভালো হয়। এছাড়া ঢাকা, কুমিল্লা, টাঙ্গাইল, ফরিদপুরেও গমের আবাদ হয়।</li> <li>৪) বাংলাদেশের সব কৃষি অঞ্চলে গমের চাষ হয় না। বিশেষ করে হাওর - বাঁওড় ও বিল অঞ্চলে গমের আবাদ করা হয় না।</li> <li>৫) যে মাটিতে <math>pH</math> (অম্লাত্বক-ক্ষারত্বক)। মাত্রা ৬.০ থেকে ৭.০ সেসব মাটিতে গম ভালো হয়।</li> </ol>

পাট চাষোপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য	ডাল চাষোপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য
<ol style="list-style-type: none"> <li>১) ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা প্রভৃতি নদ-নদীর পলিবাহিত উর্বর সমতল ভূমিতে পাট ভালো জন্মে।</li> <li>২) নদীবাহিত গভীর পলিমাটি পাট চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী।</li> <li>৩) দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটিতেও পাট ভালো জন্মে।</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>১) উঁচু ও মাঝারি জমিতে দোআঁশ, বেলে দোআঁশ, এঁটেল দোআঁশ এবং পলি দোআঁশ মাটিতে ডাল জাতীয় ফসল জন্মে। ডাল ফসল অতিরিক্ত পানি সহ্য করতে পারেনা। তাই নিকাশনযোগ্য মাটিই ডাল চাষের জন্য উপযোগী।</li> <li>২) ডাল নিরপেক্ষ বা ক্ষারীয় চুনযুক্ত মাটিতে ভালো হয়।</li> <li>৩) শুষ্ক ও ঠাণ্ডা আবহাওয়া এবং অল্প বৃষ্টিপাত ডাল ফসল চাষের জন্য উপযোগী। যদি এরূপ আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাত থাকে তবে বেলে দোআঁশ থেকে এঁটেল দোআঁশ প্রকৃতির মাটিতে অবশ্যই ডাল ফসল ভালো ফলন দিবে।</li> <li>৪) বিনা চাষে ডাল ফসল আবাদের জন্য নিচু ও মাঝারি জমি নির্বাচন করতে হবে। জমি থেকে বর্ষার পানি নেমে গেলে ভেজা মাটিতে ডাল ফসলের বীজ বোনা হয়।</li> </ol>

কাজ : শিক্ষার্থীরা মাটি উপযোগী ফসলগুলোর তালিকা তৈরি করবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।



### সবজিজাতীয় ফসলের মাটির বৈশিষ্ট্য

সব ধরনের শাকসবজিই উঁচু, সুনিষ্কাশিত দোআঁশ, বেলে দোআঁশ, পলি দোআঁশ মাটিতে ভালো জন্মে। নিচে আলু ও টমেটো চাষোপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো।

গোল আলু চাষোপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য	টমেটো চাষোপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য
১) দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি আলু উৎপাদনের জন্য বেশ উপযোগী।	১) যে কোনো প্রকার মাটিতে টমেটোর চাষ করা যায়। তবে বেলে ও কংকরময় মাটিতে টমেটো চাষ করা যায় না।
২) আলুর জন্য বায়ু চলাচল করতে পারে এরূপ নরম ও ঝুরঝুরে মাটি দরকার। এতে আলু বড় হওয়ার সুযোগ পায়।	২) দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি টমেটো চাষের উপযোগী।
৩) গোল আলুর মাটিতে প্রচুর জৈব পদার্থ থাকা দরকার।	৩) বেলে মাটিতে অধিক পরিমাণে জৈবসার প্রয়োগ করলে টমেটোর চাষ মোটামুটি করা যায়।
৪) মাটির $P^H$ মাত্রা ৬-৭ এর মধ্যে থাকা ভালো।	৪) মাটির $P^H$ মাত্রা নিরপেক্ষ মাত্রার কাছাকাছি হলে ভালো হয়।

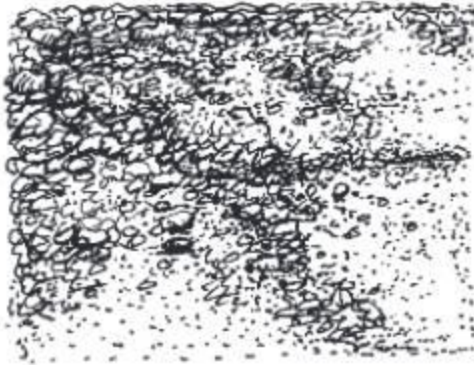
কাজ : শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে কোন ধরনের মাটিতে কোন ধরনের ফসল ভালো হয়, তার একটি তালিকা তৈরি করবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

### মৃত্তিকাভিত্তিক পরিবেশ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ফসল নির্বাচন

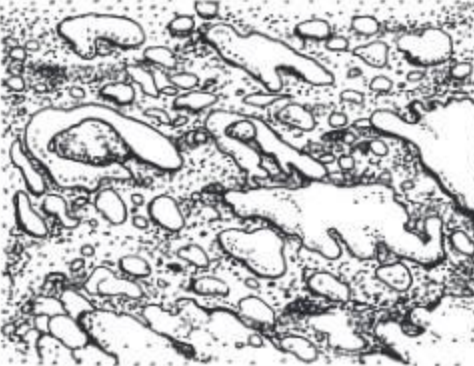
আগের পাঠগুলোতে আমরা ফসলের শ্রেণি অনুযায়ী মাটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে শিখেছি। এই পাঠে আমরা মাটির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ফসল নির্বাচন করতে শিখব। মাটির বৈশিষ্ট্য বলতে মাটির শ্রেণি, জৈব পদার্থের মাত্রা, পটাশজাত খনিজের মাত্রা,  $P^H$  মাত্রা এবং মাটির বন্ধুরতাকে বোঝায়। আমরা নিশ্চয় জেনেছি যে মাটির প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাংলাদেশকে ৩০টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। কোনো একটি কৃষি পরিবেশ অঞ্চল প্রকৃতপক্ষে সে অঞ্চলের মাটির প্রতিনিধিত্ব করে। এক একটি কৃষি অঞ্চল এক একটি প্রযুক্তিও বটে। কৃষি কর্মকাণ্ডের জন্য সবচেয়ে বড় কাজ হলো মাটির বৈশিষ্ট্য ও বন্ধুরতা অনুযায়ী ফসল নির্বাচন করা। মাটির বৈশিষ্ট্যভিত্তিক ফসল নির্বাচন কৃষি কর্মের একটি অত্যাবশ্যক প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি যত নিখুঁতভাবে ব্যবহার করা যাবে কৃষিকাজের ফলাফলও তত বেশি লাভজনক হবে। মাটির গঠন ও প্রকৃতি অনুযায়ী ৩০টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলকে নিম্নোক্ত ৫টি ভাগে ভাগ করা যায়। এই অঞ্চলগুলোর মাটির বৈশিষ্ট্যভিত্তিক ফসল নির্বাচন দেখানো হলো।

- ১। দোআঁশ ও পলি দোআঁশ মাটি অঞ্চল
- ২। কাদা মাটি অঞ্চল
- ৩। বরেন্দ্র অঞ্চল ও মধুপুর অঞ্চল
- ৪। পাহাড়ি ও পাদভূমি অঞ্চল
- ৫। উপকূলীয় অঞ্চল

মৃত্তিকা ভিত্তিক অঞ্চল	চাষ উপযোগী ফসল
<p>দোআঁশ ও পলি দোআঁশ মাটি অঞ্চল</p> <p>এ অঞ্চলের ভূমির মাটি দোআঁশ থেকে পলি দোআঁশ প্রকৃতির। উঁচু ভূমি থেকে মাঝারি নিচু ভূমি এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। দোআঁশ অঞ্চলের মাটিতে জৈব পদার্থের মাত্রা অল্প থেকে মাঝারি। এর <math>P^H</math> মাত্রা ৫.২ হতে ৬.২ পর্যন্ত। পলি দোআঁশ অঞ্চলের মাটিতে জৈব পদার্থের মাত্রা খুবই সামান্য। <math>P^H</math> মাত্রা ৪.৯ হতে ৬.১ পর্যন্ত।</p>	<p>দোআঁশ মাটিতে প্রায় সব রকমের ফসল ফলে। দোআঁশ ফসল উৎপাদনের আদর্শ মাটি। বৃষ্টির উপর নির্ভর করে কৃষকেরা ফসল উৎপাদন করেন। আবার সেচের উপর নির্ভর করেও কৃষকেরা ফসল উৎপাদন করেন। নিচে বৃষ্টি ও সেচ নির্ভর ফসলের নাম উল্লেখ করা হলো।</p> <p><b>বৃষ্টিনির্ভর ফসল নির্বাচন</b></p> <p>রবি মৌসুম : গম, মুলা, টমেটো, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ঢেঁড়স, মরিচ, চিনা বাদাম ইত্যাদি</p> <p>খরিপ-১ : রোপা আউশ, বোনা আমন, পাট (সাদা), কাউন, বেগুন, তিল, মুগ, বোনা আউশ, ভুট্টা, ধৈর্য ইত্যাদি</p> <p>খরিপ-২ : রোপা আমন (স্থানীয় উন্নত জাত ও উফশী)</p> <p><b>সেচনির্ভর ফসল নির্বাচন</b></p> <p>রবি মৌসুম : বোরো, আখ, আখ+আলু, আখ+মুগ, পিঁয়াজ, রসুন, গম, আলু, মুগ, সরিষা ইত্যাদি</p> <p>খরিপ-১ : রোপা আউশ, পাট (তোষা), তিল, ভুট্টা</p> <p>খরিপ-২ : রোপা আমন (স্থানীয় উন্নত জাত ও উফশী)</p>
<p>কাদা মাটি অঞ্চল</p> <p>মাঝারি উঁচু ও মাঝারি নিচু এলাকার মাটি কর্দম বিশিষ্ট। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পলি কাদা বিশিষ্ট মাটিও লক্ষ করা যায়। এই মাটিতে মাঝারি মাত্রায় জৈব পদার্থের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। ক্ষেত্র বিশেষে উচ্চমাত্রার জৈব পদার্থও আছে। পটাশজাত খনিজের মাত্রা মাঝারি।</p>	<p>মাঝারি নিচু ও নিচু অঞ্চলসমূহে কাদা মাটি বেশি দেখা যায়। কাদা মাটিতে ধানের উৎপাদন ভালো হয়। নিম্নে বৃষ্টিনির্ভর ও সেচনির্ভর ফসলের নাম উল্লেখ করা হলো।</p> <p>বৃষ্টিনির্ভর বা সেচনির্ভর উভয় ক্ষেত্রেই এই অঞ্চলের ফসল প্রধানত ধান। রবি মৌসুমে সেচের ব্যবস্থা থাকলে কিছু পরিমাণ অন্যান্য ফসলও জন্মে।</p>

বরেন্দ্র ও মধুপুর অঞ্চল	চাষ উপযোগী ফসল
<p>উঁচু এবং মাঝারি উঁচু ভূমি বরেন্দ্র অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মধুপুর অঞ্চল সমতল ও উঁচু ভূমি বিশিষ্ট। এর মাটি দোআঁশ। মাটিতে নিম্নমাত্রার জৈব পদার্থ ও পটাশজাত খনিজ পদার্থ রয়েছে। এর <math>P^H</math> মাত্রা ৫.৫-৬.৫।</p>  <p>চিত্র : দোআঁশ মাটি</p>	<p>এই অঞ্চলের মাটি দোআঁশ হওয়ার কারণে ঠিকমতো সেচ পেলে নানাবিধ ফসল উৎপন্ন করা যায়। নিচে বৃষ্টি ও সেচ নির্ভর ফসলের নামের তালিকা দেওয়া হলো।</p> <p><b>বৃষ্টি নির্ভর ফসল নির্বাচন</b></p> <p>রবি মৌসুম : বোরো, আখ, আলু, সরিষা, মসুর, ছোলা, বার্লি ও শীতকালীন শাকসবজি।</p> <p>খরিপ-১ : বোনা আউশ, পাট, কাউন, গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি</p> <p>খরিপ-২ : রোপা আমন (স্থানীয় উন্নত ও উফশী)</p> <p><b>সেচ নির্ভর ফসল নির্বাচন</b></p> <p>রবি মৌসুম : আখ, আখ+আলু, গম, সরিষা, চিনাবাদাম, মসুর, টমেটো, বাঁধাকপি, ছোলা, শীতকালীন শাকসবজি</p> <p>খরিপ-১ : রোপা আউশ, পাট, মুগ, টেঁড়স</p> <p>খরিপ-২ : রোপা আমন (স্থানীয় উন্নত ও উফশী)</p>
<p><b>পাহাড়ি ও পাদভূমি অঞ্চল</b></p> <p>এ অঞ্চলের ৯০ শতাংশের বেশি ভূমি উঁচু। খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাঙামাটি, কক্সবাজার ও আখাউড়া ছাড়াও আরও অনেক জেলার পাহাড়ি অঞ্চল এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই মাটি দোআঁশ। জৈব পদার্থ ও পটাশজাত খনিজের মাত্রা সামান্য। এখানকার মাটির <math>P^H</math> মাত্রা ৫-৫.৭।</p>	<p>পাহাড়ি ও পাদভূমি অঞ্চলের মাটি দোআঁশ হওয়াতে পাহাড়ি অঞ্চলেও নানাবিধ ফসল উৎপাদন হয়। নিচে এই মাটিতে উপযোগী বৃষ্টি নির্ভর ও সেচ নির্ভর ফসলের তালিকা দেওয়া হলো।</p> <p><b>বৃষ্টিনির্ভর ফসল নির্বাচন</b></p> <p>রবি মৌসুম : আখ, সরিষা, মসুর, ছোলা, গম ইত্যাদি</p> <p>খরিপ-১ : বোনা আউশ, পাট, বোনা আমন</p> <p>খরিপ-২ : রোপা আমন</p> <p><b>সেচনির্ভর ফসল নির্বাচন</b></p> <p>রবি মৌসুম : আখ, আখ+আলু, আখ+মসুর, বোরো, গম, সরিষা ইত্যাদি</p> <p>খরিপ-১ : ধৈর্য, বোনা আউশ, রোপা আউশ</p> <p>খরিপ-২ : রোপা আমন (স্থানীয় উন্নত ও উফশী)</p>



মৃত্তিকা ভিত্তিক অঞ্চল	চাষ উপযোগী ফসল
<p><b>উপকূলীয় অঞ্চল</b></p> <p>সেন্টমার্টিন দ্বীপ, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, বরিশাল ও ভোলাসহ বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা এ অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানে মাঝারি উঁচু ভূমির আধিক্য বেশি। এর মাটি দোআঁশ এবং বেলে ও পলি দোআঁশ প্রকৃতির। জৈব পদার্থ ও পটাশজাত খনিজের মাত্রা অল্প। এই অঞ্চলের মাটির <math>P^H</math> মাত্রা ৭.০ - ৮.৫।</p>  <p>চিত্র : পলিমাটি</p>	<p>যেহেতু এখানকার মাটি দোআঁশ, বেলে ও পলি দোআঁশ তাই বিভিন্ন প্রকার কৃষিপণ্য এই অঞ্চলে উৎপাদন হয়। নিচে এই অঞ্চলে বৃষ্টিনির্ভর ও সেচনির্ভর ফসলের নাম উল্লেখ করা হলো।</p> <p><b>বৃষ্টিনির্ভর ফসল নির্বাচন</b></p> <p>রবি মৌসুম : গম, সরিষা, মুগ, মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন, মুলা, বেগুন, শিম, টমেটো, চিনাবাদাম, ভুট্টা ইত্যাদি</p> <p>খরিপ-১ : বোনা আউশ, রোপা আউশ, পাট, কঁকরোল ইত্যাদি</p> <p>খরিপ-২ : রোপা আমন (স্থানীয় উন্নত ও উফশী)</p> <p><b>সেচনির্ভর ফসল নির্বাচন</b></p> <p>রবি মৌসুম : বোরো, টমেটো, আলু, সরিষা, তরমুজ, মুগ, মরিচ ইত্যাদি।</p> <p>খরিপ-১ : রোপা আউশ</p> <p>খরিপ-২ : রোপা আমন (স্থানীয় উন্নত ও উফশী)</p>

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ গ্রাম/উপজেলা কোন পরিবেশ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত তা শিক্ষকের কাছ থেকে জেনে নেবে। অতঃপর গ্রামের মাটির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে মাটির প্রকার উল্লেখ করে এ সম্পর্কে প্রতিবেদন লিখে জমা দেবে।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### ফসল উৎপাদনের জন্য জমি প্রস্তুতি

কৃষির যত কাজ আছে তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো জমি প্রস্তুতি। সব ফসলের জন্য জমি প্রস্তুতি এক রকম নয়। যেমন, বোরো বা রোপা আমন ধানের ক্ষেত্রে আগে চারা উৎপাদন করতে হবে, তারপর মূল জমি প্রস্তুত করে চারা রোপণ করতে হবে। কিন্তু বোনা আউশ বা বোনা আমনের ক্ষেত্রে চারা উৎপাদন না করে সরাসরি প্রস্তুতকৃত মূল জমিতে বীজ ছিটিয়ে দিতে হয়। প্রায় একইরূপ গমের ক্ষেত্রেও ভালোভাবে জমি চাষ দিয়ে বীজ ছিটিয়ে বুনতে হবে। জমি প্রস্তুতির সাথে বহুমুখী কাজ জড়িত। যথা: জমি চাষ, মই দেওয়া, সার প্রয়োগ ইত্যাদি। নিচে ফসলভিত্তিক প্রত্যেকটি কাজ আলোচনা করা হলো।

#### ধান চাষের জন্য জমির প্রস্তুতি

ধান বাংলাদেশে সারা বছর চাষ করা হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বীজতলায় চারা উৎপাদন করতে হয়। ধানের বীজতলা তৈরি ও জমি প্রস্তুতি ৪র্থ অধ্যায় এর ১ম পরিচ্ছেদ থেকে আমরা জানতে পারব।

#### গম চাষের জন্য জমি প্রস্তুতকরণ

গম রবি শস্য। বর্ষার মৌসুম শেষ হওয়ার পর মধ্য কার্তিক-মধ্য অগ্রহায়ণ পর্যন্ত গম চাষের উপযুক্ত সময়। মাটির 'জো' দেখে জমিতে লাঙল চালনা করা হয়। গমের মাটি ঝুরঝুরা করে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। এজন্য ৩ থেকে ৪ বার আড়াআড়ি জমি চাষ দিয়ে বার কয়েক মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করতে হয়। জমিতে যাতে কোনো বড় ঢেলা না থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। গমের জন্য দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটি উপযুক্ত। এ মাটি সহজেই ঝুরঝুরা হয়। পাওয়ার টিলারের সাথে রটোভেটের সংযোগ করে জমি চাষ দিলে মাটি ভালো চাষ হয় এবং একই সাথে মইও দেওয়া হয়। ঝুরঝুরা মাটি গমের অঙ্কুরোদগমের জন্য খুবই উপযোগী। অষ্টম শ্রেণিতে আমরা গম চাষে সার প্রয়োগ সম্পর্কে জেনেছি।

#### ডালজাতীয় শস্যের জন্য জমি প্রস্তুতি

বাংলাদেশে ডালজাতীয় শস্যের জন্য জমি চাষ করা হয় না। তবে মসুর ডালের জন্য জমিতে দুই-একটি চাষ দেওয়া হয়। বর্ষা শেষ হলে আশ্বিন-কার্তিকে যখন নদীর চর ও নিচু এলাকা হতে পানি সরে যায়, তখন নরম পলি মাটিতে বিনা চাষে বীজ বপন করা হয়। চাষ দেওয়া সম্ভব হলে দুইএকটি চাষও দেওয়া হয়। চাষের পর পতিত জমিতে আবার অনেক সময় রোপা ও বোনা আমনের জমিতে ফসল থাকা অবস্থায় ডালের বীজ ছিটিয়ে দেওয়া হয়।

#### আলু চাষের জন্য জমি প্রস্তুতি

নিচু এলাকায় বর্ষার পানি নেমে গেলে বা উঁচু এলাকায় আশ্বিন মাস হতে আলু চাষের জন্য জমি প্রস্তুতির কাজ শুরু করা হয়। সাধারণত দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটিতে আলুর চাষ করা হয়। এই মাটি চাষ করা মোটামুটি সহজ। আলুর জমি ৫-৬ বার চাষ ও বার কয়েক মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করে জমি প্রস্তুত করা হয়। আজকাল পাওয়ার টিলার দ্বারা চাষ করা হয় বলে ৩-৪ বার আড়াআড়ি চাষ দিলেই ঝুরঝুরা হয় এবং সমান করা হয়।



### নালা তৈরি ও সার প্রয়োগ পদ্ধতি

জমি ভালোভাবে চাষ ও মই দেওয়ার পর জমি সমান করে বীজ বপনের জন্য জমির এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত নালা করতে হবে। প্রত্যেকটি নালা প্রায় ১০-১২ সেমি গভীর করতে হবে। একটি নালা থেকে আর একটি নালার দূরত্ব হবে ৬০ সেমি। অতঃপর নালার মধ্যে ১৫ সেমি দূরে দূরে বীজ বুনে দিতে হয়। আলুচাষে সার প্রয়োগ পদ্ধতি পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

### জমি প্রস্তুতির গুরুত্ব

ভূমি কর্ষণ জমি প্রস্তুতির প্রথম ধাপ। ভূমি কর্ষণের সংকীর্ণ অর্থ হলো ফসল ফলানোর উদ্দেশ্যে জমির মাটি যন্ত্রের সাহায্যে খুঁড়ে আলগা করা। কিন্তু ভূমি কর্ষণের সাথে নানা প্রযুক্তি জড়িত। যেমন, বীজকে অঙ্কুরোদগমের জন্য উপযুক্ত স্থানে ও সঠিক গভীরতায় স্থাপন করা, মাটিতে বায়ু চলাচলের সুবিধা সৃষ্টি করা, উপরের মাটি নিচে এবং নিচের মাটি উপরে নিয়ে আসা, মাটিতে অণুজীবের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি। এসব দিক বিবেচনা করে জমি প্রস্তুতির গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। আর এই গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য ভূমি কর্ষণকে সংজ্ঞায়িত করা যায় যে, “শস্যের বীজ মাটিতে সুস্থভাবে বপন ও পরবর্তী পর্যায়ে চারাগাছ বৃদ্ধির জন্য মাটিকে যে প্রক্রিয়ায় খুঁড়ে বা আঁচড়ে আগাছামুক্ত, নরম, আলগা ও বুরবুরা করা হয়, তাকে ভূমি কর্ষণ বলে”। ভূমি কর্ষণ জমি প্রস্তুতির প্রাথমিক ধাপ। আদিকাল থেকেই মানুষ ভূমি কর্ষণ তথা জমি প্রস্তুতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাই তারা কাঠের বা পাথরের তৈরি সুচালো যন্ত্রের সাহায্যে মাটি আলগা ও নরম করে ফসলের বীজ বুনতে বা চারা রোপণ করতেন। ফসলভেদে ভূমি কর্ষণের তারতম্য হতে পারে কিন্তু এর গুরুত্ব কখনো খাটো করে দেখার বিষয় নয়।

জমি প্রস্তুতির ক্ষেত্রে খনার বচনে উল্লেখ আছে যে,

ষোল চাষে মুলা

তার অর্ধেকে তুলা

তার অর্ধেকে ধান

বিনা চাষে পান।

অর্থাৎ মুলা চাষের জন্য ষোলটি চাষ দিতে হবে যতক্ষণ না মাটি বুরবুরা বা আলগা হয়। তুলা চাষের জন্য আট চাষ দিতে হবে আর ধানের জন্য চারটি চাষই যথেষ্ট। মজার ব্যাপার হলো পান উৎপাদনে কোনো চাষই লাগেনা। আর এই ধারণা থেকেই আজকাল বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে ‘বিনা চাষ’ প্রথা প্রচলন করা হয়েছে। এখন অনেক কৃষকই বিনা চাষে ভুট্টা, ডাল ইত্যাদি ফসল উৎপাদন করেন।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা মাঝে মাঝে ফসলের মাঠ পরিদর্শন করবে। কৃষকেরা গম চাষের জমি তৈরি করছেন তা দেখবে এবং জমি প্রস্তুতির কর্মকাণ্ডগুলো খাতায় লিখবে। এভাবে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ফসলের বিভিন্ন রকমের জমি প্রস্তুতির নিয়ম খুঁজে বের করে লিখবে।

### ভূমি কর্ষণ তথা জমি প্রস্তুতকরণের উদ্দেশ্য

ভূমি কর্ষণের উদ্দেশ্য থেকেই জমি প্রস্তুতকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায়। নিচে ভূমি কর্ষণের উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হলো:

- ১। মাটি বীজের অঙ্কুরোদগম অবস্থায় আনয়ন : যে প্রক্রিয়ায় মাটিকে ঝুরঝুরা করে বীজের অঙ্কুরোদগমের অবস্থায় আনা ও ফসল জন্মানোর উপযোগী করা হয় তাকে কর্ষণ বলে। জমিতে বারবার চাষ দেওয়ার ফলে মাটি নরম হয়, দানাগুলো মিহি হয় আর তাতে বীজ গজানো ও ফসল জন্মানোর এক ভৌত অবস্থা সৃষ্টি হয়। জমি কীভাবে কতটুকু প্রস্তুত করা হবে তা নির্ভর করে মাটির প্রকারভেদ, মাটির জৈব পদার্থ ও রস এবং ফসলের প্রকারের উপর। দোআঁশ, বেলে বা বেলে দোআঁশ মাটির মতো হালকা মাটিতে ৩/৪ বার চাষ ও মই দিলে ভূমি কর্ষণ ফসল উৎপাদন উপযোগী হয়। কিন্তু কাদামাটির মতো ভারী মাটিতে ৫/৬ বার চাষের প্রয়োজন পড়ে। মাটিতে রস থাকলে চাষের সময় মাটি সহজেই ঝুরঝুরা হয় আর রস না থাকলে বড় বড় ঢেলা হয়। মাটিতে জৈব পদার্থ বেশি থাকলে মাটির কণা দানাদার হয় ও সংযুক্ত থাকে। আর তাতে বীজের অবস্থান ভালো থাকে এবং সহজেই অঙ্কুরোদগম হয়।
- ২। মাটি সার ও জৈব পদার্থের মিশ্রকরণ : জমিতে সার এবং জৈব পদার্থ প্রয়োগ করতে হয়। ভূমি কর্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মাটির সাথে সার ও জৈব পদার্থের মিশ্রণ ঘটানো। এ জন্যে জমি দুই একবার চাষ দেওয়া হলে গোবর বা কমপোস্ট জমিতে ছিটাতে হয়। পরবর্তী চাষের সময় এগুলো মাটিতে মিশে যায়। অনেক সময় ধৈর্যের চাষ করেও সবুজ সার হিসাবে ফুল আসার আগে চাষ দিয়ে মাটির সাথে মেশানো হয়। তাতে মাটির উর্বরতা বাড়ে।
- ৩। ভূ-অভ্যন্তরস্থ কীট-পতঙ্গ দমন : মাটির অভ্যন্তরে অনেক পোকা আছে যেগুলো ফসলের অনেক ক্ষতি করে। ভূমি কর্ষণের সময় এসব পোকা, পুস্তলি ও ডিম উন্মুক্ত হয় এবং পাখিরা এগুলো খেয়ে নিধন করে। আর সূর্যালোকও সেগুলো ধ্বংস করে। মাটির নিচের পোকাগুলোর মধ্যে উই, উরচুঙ্গা ও পিপীলিকা প্রধান।
- ৪। মাটির পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ : ভূমি কর্ষণ মাটির পানি ধারণক্ষমতা বাড়ায়। অকর্ষিত ভূমি থেকে পানি তাড়াতাড়ি বাষ্প হয়ে যায় অথবা পানি গড়িয়ে অন্যত্র চলে যায়। কিন্তু কর্ষিত জমিতে সার বা সেচের পানি আটকা পড়ে যা পরে মাটি শুষে নেয়। অর্থাৎ কর্ষিত জমির মাটির পানি ধারণক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পায়। এরূপ মাটিতে বীজ বুনলে ভালো অঙ্কুরোদগম হয় এবং ফসলের বৃদ্ধি ঘটে।
- ৫। মাটিস্থ জীবাণুসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধি : মাটিতে অনেক জীবাণু আছে, যা মাটিকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে তন্মধ্যে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া প্রধান। এসব জীবাণু মাটিতে থেকে মাটির জৈব পদার্থ পচনে সাহায্য করে। ভালোভাবে ভূমি কর্ষণ করলে মাটিস্থ এই জীবাণুগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। গাছ সহজে পুষ্টি গ্রহণ করতে পারে এবং ফলন অনেক ভালো হয়।
- ৬। মাটির ক্ষয়রোধ : ভূমি কর্ষণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো উঁচু-নিচু জমিকে সমতল করা এবং আঁটসাঁট করা। তাতে বৃষ্টির বা সেচের পানি গড়িয়ে অন্যত্র যেতে পারে না। আর এতে একদিকে ভূমিক্ষয় নিরোধ হয় আর অন্যদিকে পানির সুব্যবহার হয়।

## জমি চাষের বিবেচ্য বিষয়

জমি কীভাবে চাষ করতে হবে তা নির্ভর করে কতগুলো বিষয়ের উপর। বিষয়গুলো হচ্ছে :

- ১। ফসলের প্রকার
  - ২। মাটির প্রকার
  - ৩। আবহাওয়া ও
  - ৪। খামারের প্রকার ইত্যাদি।
- ১। ফসলের প্রকার : জমি চাষ কেমন হবে তা নির্ভর করে কৃষক কী কী ফসল ফলাবেন। যেমন ধান চাষের জন্য কয়েকবার আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে জমি কর্দমাক্ত করতে হয়। কিন্তু মুলা, মরিচ, ইত্যাদির জন্য মাটি মিহি বুরবুরা করে চাষ করতে হয়। আখ ও আলু চাষের জন্য গভীরভাবে জমি চাষ করতে হয়।
  - ২। মাটির প্রকার : জমি চাষ মাটির প্রকারের উপর নির্ভর করে। কাদা মাটিতে বেশি আর্দ্রতা বা ভেজা থাকলে চাষ করা যায় না। মাটির “জো” আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। আবার হালকা মাটি যেমন দোআঁশ, পলি দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটিতে আর্দ্রতা একটু বেশি থাকলেও চাষ করা যায়। এই মাটিগুলো চাষের জন্য খুব ভালো।
  - ৩। আবহাওয়া : আবহাওয়ার প্রভাবে মাটিতে আর্দ্রতার তারতম্য ঘটে। বৃষ্টি-বাদল কম হলে মাটিতে আর্দ্রতার অভাব ঘটে। এই অবস্থায় জমিতে গভীর চাষ দেওয়া অনুচিত। মাটিতে গভীর চাষ দিলে আর্দ্রতার অভাব দেখা দেবে। আবার বর্ষাকালে যখন প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় তখন মাটিতে প্রচুর আর্দ্রতা থাকে এবং রোপা আমন চাষের জন্য জমি প্রস্তুত করা সহজ হয়।
  - ৪। খামারের প্রকার : বাড়ির আশে পাশের জমিতে নিবিড় শস্য চাষ করা হয়। নিবিড় শস্য চাষে একটা ফসল তুলেই আর একটা ফসল লাগানো হয়। তখন জমিতে গভীর চাষের দরকার পড়ে না। জমির মাটি এমনভাবেই আলগা থাকে। তবে অনিবিড় শস্য চাষে জমিতে গভীর চাষের দরকার পড়ে।



## তৃতীয় পরিচ্ছেদ ভূমিক্ষয় ও ক্ষয়রোধ

### ভূমিক্ষয়

মুখলধারায় বৃষ্টির সময় মাটির দিকে লক্ষ কর। দেখবে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা যখন ভূপতিত হয়, তখন বৃষ্টির আঘাতে ছোট ছোট গর্তের সৃষ্টি হয় আর এতে পানি ঘোলা হয়। কাদামিশ্রিত ঘোলা পানি অপেক্ষাকৃত নিচের দিকে ধাবিত হয়। এভাবে বৃষ্টিপাতের সময় কাদামিশ্রিত ঘোলা পানির মাধ্যমে ভূমিক্ষয় হয়। আবার ঝড়-বাতাস বা ঘূর্ণিঝড়ের দিকে লক্ষ করো। দেখবে বাতাসের বেগের সাথে মাটির কণা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে উড়ে যায়। বাইরে থাকলে তোমার চোখে মুখেও মাটির কণাগুলো আঘাত করে। অর্থাৎ বাতাস দ্বারাও ভূমিক্ষয় হয়। এখন হয়তো বলতে পারবে যে বিভিন্ন কারণে জমির মাটির উপরিভাগ হতে মাটির কণা চলে যাওয়াকে ভূমিক্ষয় বলে।

ভূমিক্ষয় প্রক্রিয়ায় একস্থানের মাটি ক্ষয় হয়ে অপেক্ষাকৃত নিম্নতম স্থানে জমা হয়। ভূমিক্ষয়ের প্রধান কারণগুলো হচ্ছে বৃষ্টিপাত, ঘূর্ণিঝড়, নদীর শ্রোত, বনজঙ্গল পরিষ্কার করে চাষাবাদ, পাহাড়ের ঢালে চাষাবাদ ইত্যাদি। ক্রমাগত বৃষ্টিপাতের ফলে মাটি যখন পানি শোষণক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তখন অতিরিক্ত পানি মাটির উপরের স্তরের কিছু মৃত্তিকা কণা বহন করে নিম্ন দিকে প্রবাহিত হয়। পানি প্রবাহের সাথে ভূমির উপরিস্তরের মাটি আলাগা হয় এবং নিম্নভূমিতে গিয়ে জমা হয়। তেমনি কর্ষিত জমি হতে বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমেও ধুলার আকারে মাটি দূরদূরান্তে চলে যায়। নদীর শ্রোত নদী তীরের পাড় ভেঙে মাটি অন্যস্থানে বহন করে নিয়ে যায় ও চরাঞ্চল গড়ে তোলে। মানুষ যখন বন-জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে ফসলের আবাদ করে তখন ভূমি উন্মুক্ত হয়। আর গবাদি পশুও বিচরণ করে। এতে ভূমির ক্ষয় হয়। একইভাবে পাহাড়ের জঙ্গল কেটে পাহাড়ের ঢালে চাষাবাদ করে। বৃষ্টিপাতের জলশ্রোত উপরের স্তরের মাটি উপত্যকায় পরিণত হয়।

### ভূমিক্ষয়ের প্রকার

ভূমিক্ষয় দুই প্রকার। যথা: (১) প্রাকৃতিক ভূমিক্ষয় ও (২) মনুষ্য কর্তৃক ভূমিক্ষয়। নিচে এগুলো আলোচনা করা হলো:

১। প্রাকৃতিক ভূমিক্ষয় : প্রকৃতিতে ব্যাপকভাবে ভূমিক্ষয় হয়। ভূ-সৃষ্টির শুরু থেকেই এর ক্ষয় শুরু হয়েছে। দীর্ঘকালের এই ক্ষয়ের ফলেই নদীর মোহনায় বা সমুদ্রে চর সৃষ্টি হয়েছে বা দ্বীপ গড়ে উঠেছে। এই ভূমিক্ষয়ের ফলে পৃথিবীর অনেক অঞ্চল উর্বর হয়েছে, আবার অনেক অঞ্চল অনুর্বর হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অনবরত ভূমিক্ষয় হচ্ছে অথচ আমরা তা উপলব্ধি করি না।



চিত্র : প্রাকৃতিক ভূমিক্ষয়

বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত প্রাকৃতিক কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম। এগুলো চলার পথে ভূপৃষ্ঠের মাটির কণা বহন করে নিয়ে যায়। এ জন্য যে পরিমাণ মাটির ক্ষয় হয় তা খুবই নগণ্য এবং দৃষ্টিগোচর হয় না। হয়তো তাই ভূমির এই ক্ষয়কে বলা হয় স্বাভাবিক ক্ষয়। প্রাকৃতিক ভূমিক্ষয় মাটি গঠন প্রক্রিয়ারই একটি অংশ বলে বিবেচিত হয়। মাটি গঠন ও ভূমিক্ষয়ের মধ্যে একটি ভারসাম্য রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘকাল ভূমিক্ষয়ের ফলে কৃষিকাজ একটা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে।

#### প্রাকৃতিক ভূমিক্ষয়ের শ্রেণিবিভাগ

ভূমিক্ষয়কে প্রধানত দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা :

- ক. বৃষ্টিপাতজনিত ভূমিক্ষয় এবং
- খ. বায়ুপ্রবাহজনিত ভূমিক্ষয়।

ক. বৃষ্টিপাতজনিত ভূমিক্ষয় : বৃষ্টিপাতের কারণে বাংলাদেশে ব্যাপক ভূমিক্ষয় হয়। এই ভূমিক্ষয়কে নিচের চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়;

- i) আন্তরণ ভূমিক্ষয়
- ii) রিল ভূমিক্ষয়
- iii) নালা বা গালি ভূমিক্ষয়
- iv) নদী ভাঙন।

নিচে এই ভূমিক্ষয়গুলোর আলোচনা করা হলো

i) আন্তরণ ভূমিক্ষয় : যখন বৃষ্টির পানি বা সেচের পানি উঁচু স্থান থেকে ঢাল বেয়ে জমির উপর দিয়ে নিচের দিকে প্রবাহিত হয় তখন জমির উপরিভাগের নরম ও উর্বর মাটির কণা কেটে পাতলা আবরণের বা আন্তরণের মতো চলে যায়। একেই বলা হয় আন্তরণ ভূমিক্ষয়। বৃষ্টির ফলে যে ভূমিক্ষয় হয় তা সহজে চোখে পড়েনা। কিন্তু কয়েক বৎসর পর বোঝা যায় যে জমির উর্বরতা হ্রাস পেয়েছে। আর এর কারণ হলো আন্তরণ ভূমিক্ষয়।

ii) রিল ভূমিক্ষয় : রিল ভূমিক্ষয় আন্তরণ ভূমিক্ষয়েরই দ্বিতীয় ধাপ। প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে পানি বেশি হলে জমির ঢাল বরাবর লম্বাকৃতির রেখা সৃষ্টি হয়। যা অনেকটা হাতের রেখার মতো। এই ছোট ছোট রেখা কালক্রমে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বড় হতে থাকে। বৃষ্টির পানির শ্রোতধারায় উর্বর মাটি জমি থেকে স্থানচ্যুত হয় ফলে জমি উর্বরতা হারায় এবং কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারেও অসুবিধার সৃষ্টি করে।



চিত্র : রিল ভূমিক্ষয়

iii) নালা বা গালি ভূমিক্ষয় : এই ভূমিক্ষয় আন্তরণ ভূমিক্ষয়ের তৃতীয় ধাপ। অর্থাৎ রিল ভূমিক্ষয় থেকেই নালা বা গালি ভূমিক্ষয়ের উদ্ভব। দীর্ঘকাল ধরে রিল ভূমিক্ষয়ের ফলে এর ছোট ছোট নালাগুলো দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর ফসলের মাটিও বেশি ক্ষয় হতে থাকে। একসময় এগুলো নর্দমা বা ছোট নদীর মতো দেখায়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যত বেশি হবে নালা বা গালি ভূমিক্ষয় ততই বেশি হবে। বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে এরূপ ভূমিক্ষয় দেখা যায়।



**iv) নদীভাঙন :** নদীভাঙন বাংলাদেশের ভূমিক্ষয়ের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ, গোয়ালন্দ প্রভৃতি অঞ্চলে প্রতি বছরই নদীভাঙনে শত শত হেক্টর জমি নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে। বর্ষার শুরুতে কিংবা বর্ষার শেষে নদীতে প্রবল স্রোত সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে নদীতীরের কৃষিজমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়।



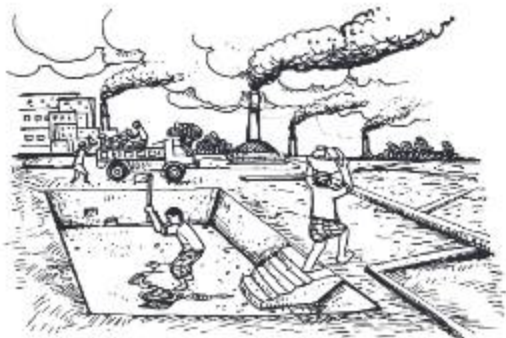
চিত্র : নদী ভাঙন

#### খ. বায়ুপ্রবাহজনিত ভূমিক্ষয়

গতিশীল বায়ুপ্রবাহ কর্তৃক এক স্থানের মাটি অন্যত্র বয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়াকে বাতাজনিত ভূমিক্ষয় বলে। যেসব এলাকা সমতল, তুলনামূলকভাবে গাছপালা কম এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কম, সেসব এলাকায় বাতাজনিত কারণে ভূমিক্ষয়ের প্রকোপ দেখা যায়। বেলে ও বেলে দোআঁশ মাটি আলগা ও হালকা। কাজেই প্রবল বেগে বায়ুবাহিত হলে এসব মাটি সহজেই উড়ে যায়। আর যে স্থানে মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ একেবারেই কম সে স্থানের বায়ুজনিত ভূমিক্ষয় আরও বেশি।

মরুভূমিতে বায়ুপ্রবাহ উর্বর অঞ্চলে বালি নিক্ষেপ করে অনুর্বর করে তোলে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে দিনাজপুর-রাজশাহী অঞ্চলে চৈত্র-বৈশাখ মাসে বায়ুপ্রবাহজনিত ভূমিক্ষয়ের প্রকোপ সামান্য দেখা যায়। এর ফলে বায়ু প্রবাহে আবাদি জমির উর্বরতা কমে যায়।

**২। মনুষ্যকর্তৃক ভূমিক্ষয় :** মানুষের বাঁচার জন্যে খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য উৎপাদনের জন্যে মানুষ মাটিকে যথেষ্ট ব্যবহার করে আসছে কৃষি সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে। ভূমিকর্ষণ, পানি সেচ, পানি নিষ্কাশন ইত্যাদি কাজ কৃষিকাজের মূল অংশ। এ কাজগুলো দ্বারা মাটিকে প্রতিনিয়ত উৎপীড়ন করা হচ্ছে। ফলে ভূমিগুলো প্রাকৃতিক শক্তির তথা বৃষ্টি ও বাতাসের নিকট উন্মোচিত করছে এবং ক্ষয় হচ্ছে। মাটিকে যত ব্যবহার করা হবে ততই এর ক্ষয় হতে থাকবে। অনাচ্ছাদিত মাটি বৃষ্টি, বায়ু, বন্যা, এগুলোর আক্রমণের শিকার। পাহাড়ি এলাকায় জুম চাষের ফলে বা ধাপ করে চাষ করার ফলে মাটি আলগা হয়ে যায়। মুষলধারায় বৃষ্টির ফলে সেখানকার মাটিতে পাহাড়ি ধস নামে। এতে বিপর্যয় আকারে ভূমিধস হয়। শুধু তাই নয়- এতে জান মালেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়। তা'ছাড়া গবাদিপশু বিচরণকালে অনেক ধূলাবালি উড়ে যায়। মেঠোপথে চলার সময়ও ধূলাবালি উড়ে।



চিত্র : মনুষ্য কর্তৃক ভূমিক্ষয়

#### ভূমিক্ষয়ের ক্ষতির বিভিন্ন দিক

ভূমিক্ষয়ের ক্ষতিকারক দিকগুলো নিম্নরূপ:

(১) ভূমিক্ষয়ের কারণে জমির পুষ্টিসমৃদ্ধ উপরের স্তরের মাটি অন্যত্র চলে যায়। ফলে মাটির উর্বরতার ব্যাপক অপচয় হয়।



- (২) ভূমিক্ষয়ের ফলে মাটিতে পুষ্টির অভাব দেখা দেয়। ফলশ্রুতিতে ফসলের বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে।
- (৩) ক্রমাগত ভূমিক্ষয়ের কারণে নদী-নালা, হাওর-বিল ভরাট হয়ে যায়। ফলে দেশে প্রায়ই বন্যার প্রাদুর্ভাব ঘটে। এতে ফসল, পশুপাখি, বাড়িঘরের অনেক ক্ষতি হয়।
- (৪) ভূমিক্ষয়ের বিরাট অংশ নদীতে জমা হয়। এতে নদীর গভীরতা কমে যায় এবং নৌ চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।
- (৫) প্রবাদ আছে যে উর্বর মাটির ক্ষয় মানে সভ্যতার ক্ষয়।

### ভূমিক্ষয়ের কারণ

অনেক কারণেই ভূমিক্ষয় হয়। উপরের ভূমিক্ষয়ের প্রকার থেকেও অনুধাবন করা যায় ভূমিক্ষয়ের কারণ কী। নিচে ভূমিক্ষয়ের কারণগুলো উল্লেখ করা হলো।

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| (১) বৃষ্টিপাত        | (২) ভূমি ঢাল           |
| (৩) মাটির প্রকৃতি    | (৪) শস্যের প্রকৃতি     |
| (৫) জমি চাষের পদ্ধতি | (৬) নিবিড় চাষ         |
| (৭) বায়ু            | (৮) মানুষের কার্যাবলি। |

**বৃষ্টিপাত :** বৃষ্টিপাত চাষাবাদের জন্য যেমন ভালো আবার ভূমিক্ষয়ের প্রধান কারণ। বৃষ্টিপাতের তীব্রতা, সংখ্যা ও পরিমাণ ভূমিক্ষয়কে প্রভাবিত করে। মুসলধারায় বৃষ্টি হলে বৃষ্টির ফোঁটা বড় হয় এবং মাটিতে সজোরে আঘাত করে আর এতে মাটির কণা আলগা হয়। মাটি যখন পানি শোষণক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তখন অতিরিক্ত পানি একটি প্রবাহ সৃষ্টির মাধ্যমে উপর থেকে অপেক্ষাকৃত নিচের দিকে ধাবিত হয়। বাওয়ার পথে পানির সঙ্গে আলগা ও নরম মাটি স্থানান্তরিত হয়। পানির বেগ বত বেশি হবে মাটির ক্ষয়ও তত বেশি হবে।

**ভূমির ঢাল :** অধিক ঢালু মাটিতে অধিক বেগে পানি নিচের দিকে ধাবিত হয়। এজন্য পার্বত্য এলাকায় সমতল এলাকার চেয়ে ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ বেশি। বাংলাদেশের বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি এলাকায় সাধারণত জুম চাষ করা হয়। ফলে জুম চাষে এলাকার মাটি আলগা হয় এবং বৃষ্টিপাতের ফলে এই মাটি বৃষ্টির পানির সাথে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে চলে যায়। কয়েক বছরের মধ্যে জুম চাষের স্থানটি অনুর্বর হয়ে পড়ে।

**মাটির প্রকৃতি :** ভূমিক্ষয় মাটির কাঠামো, বুনট ও জৈব পদার্থের উপস্থিতির উপর নির্ভর করে। বেলে-দোআঁশ মাটি অধিক সচ্ছিদ্রতা বলে সম্পূর্ণ বৃষ্টির পানি সহজেই স্তরে নিতে পারে। তাই এই মাটির ভূমিক্ষয় কম। কিন্তু কাদা ও ভারী মাটি সচ্ছিদ্রতা কম থাকায় এর শোষণক্ষমতাও কম। ফলে সামান্য বৃষ্টি হলেও মাটির উপরে পানি জমে যায় এবং ভূমির ক্ষয় করে মাটি নিচের দিকে ধাবিত হয়।

**চাষ পদ্ধতি ও শস্যের প্রকৃতি :** পাহাড়ি জমিতে ঢালের আড়াআড়ি চাষ না করে যদি ঢালের বরাবর চাষ করা হয়, তবে বৃষ্টিপাতের ফলে ভূমিক্ষয় হয়। খাড়া পাহাড়ের গায়ে ধাপ সৃষ্টি করে ফসলের চাষ করা হয়। কিন্তু যদি তা না করে সাধারণভাবে জমি চাষের চেষ্টা করা হয় তবে পাহাড়ি ভূমিধস বা ভূমিক্ষয়ের শিকার হয়। জমি ঘন ঘন চাষ করলেও ভূমিক্ষয় হয়।

যেসব ফসল মাটি ঢেকে রাখে, সেগুলো মাটিকে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে। যেমন চিনাবাদাম, মাসকলাই, খেসারি ইত্যাদি। কিন্তু আখ, ভুট্টা, ধান, গম ইত্যাদি প্রাথমিক পর্যায়ে মাটিকে ঢেকে রাখে না। ফলে ভূমিক্ষয় হয়।

**বায়ুপ্রবাহ :** যে অঞ্চলে গাছপালা কম সে অঞ্চলে বায়ুপ্রবাহ দ্বারা ভূমিক্ষয় হয়। বাংলাদেশের রাজশাহী ও দিনাজপুর অঞ্চলে এরূপ ভূমিক্ষয় হয়।

**মানুষের কার্যাবলি :** ভূমিক্ষয়ের প্রকৃত কারণ মানুষ নিজে। ক্ষুধার অন্ন জোগাড় করতে মানুষ জঙ্গল পরিষ্কার করতে শুরু করে। তাতে মাটির উপরিভাগ উন্মুক্ত হয় এবং ভূমিক্ষয়েরও সূচনা হয়। তাছাড়া মানুষ ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ইত্যাদি নির্মাণ করেও কৃষিজমি বিনষ্ট করছে এবং ভূমিক্ষয় করছে।

#### ভূমিক্ষয়রোধের কার্যকরী উপায়সমূহ

কৃষিকাজের অন্যতম একটি প্রযুক্তি হলো ভূমিক্ষয়রোধ করা। এই প্রযুক্তি ভূমিক্ষয়রোধের কতগুলো পদ্ধতির সমষ্টি। পদ্ধতিগুলো হচ্ছে-

#### পানিপ্রবাহ হ্রাসকরণ

- ১) ভূমিক্ষয় কমাতে পানি প্রবাহের বেগ কমানো জরুরি। বিভিন্নভাবে পানি প্রবাহের বেগ কমানো যায়। যথা, বাঁধ বা আইল দিলে পানির বেগ কমে আসে, মাটি পানি শোষণের সময় পায় ও ভূমিক্ষয়রোধ হয়।
- ২) রিল ভূমিক্ষয়ের ফলে যে ছোট ছোট নালার সৃষ্টি হয় তা ভরাট করে সমান করে দিলে পানির বেগ কমে যাবে এবং ভূমিক্ষয়ও রোধ হবে।
- ৩) বড় নালার মধ্যে আগাছা জন্বাতে দেওয়া এবং শেষ প্রান্তে খুঁটি পুতে তারের জাল বাঁধলে পানির বেগ কমে যাবে।
- ৪) উপরন্তু তারের জালের মূলে খড়কুটা ফেললে পানির বেগ একেবারেই মন্থর হবে এবং ভূমিক্ষয়রোধ হবে।

#### পানি নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্তকরণ

জমিতে পানি জমা থাকলে এর সাথে বৃষ্টির পানি যোগ হলে প্রবল স্রোতের সৃষ্টি হয় এবং জমির মাটি আলগা হয়ে সরে যায়। কাজেই কৃষিজমি কয়েক খণ্ডে ভাগ করে প্রতি খণ্ড হতে পানি সরালে ভূমির এরূপ ক্ষয়রোধ করা সম্ভব হবে।

#### জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ

জমিতে জৈব পদার্থ অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করলে মাটির দানাবন্ধন ভালো হয়। বৃষ্টির পানি মাটিকে ক্ষয় না করে সহজেই নিচের দিকে চলে যেতে পারে। যে জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ কম সে জমির মাটি সহজেই ক্ষয় হয়।

#### পাহাড়ে ধাপে ধাপে ফসল চাষ করা

জুম চাষের ফলে পাহাড়ের মাটি সহজেই আলগা হয় ও ভূমিক্ষয় হয়। জুম চাষ না করে যদি পাহাড়ের গায়ে চতুর্দিক ঘিরে সমতল সিঁড়ি বা ধাপ করে চাষাবাদ করা হয় তা হলে বৃষ্টির পানি পাহাড়ের মাটির ক্ষয় করতে পারবে না।

#### কন্টোর পদ্ধতিতে চাষ করা

এই পদ্ধতিতে পাহাড়ের ঢালের আড়াআড়ি সমান্তরাল লাইনে জমি চাষ করা হয়। ঢালের আড়াআড়ি জমি চাষ হয় বলে বৃষ্টির পানির গতি কম হয়। মাটি স্থানান্তরিত না হয়ে ফসলের গোড়ায় আটকে থাকে।

**কাজ :** ১. শিক্ষার্থীরা নিজ এলাকায় কৃষিজমি ক্ষয়ের কারণ এবং প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে প্রতিবেদন লিখবে।

২. শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে ভূমিক্ষয়রোধে সচেতনতামূলক পোস্টার লিখবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### বীজ সংরক্ষণ

#### বীজ সংরক্ষণ প্রক্রিয়া

বীজ উৎপাদন থেকেই বীজ সংরক্ষণের শুরু। জমিতে এর বপন বা রোপণের মাধ্যমে বীজ সংরক্ষণ প্রক্রিয়া শেষ। তাহলে দেখা যাচ্ছে বীজ সংরক্ষণ বলতে বীজের উৎপাদন, শুকানো, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ, বিপণন যাবতীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাকেই বোঝায়।

#### বীজ সংরক্ষণের শর্তসমূহ

##### বীজ উৎপাদন

বীজ শস্য উৎপাদনের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো মনে রাখা দরকার :

- ১) কেবল বীজের জন্যই ফসলের চাষ করা;
- ২) নির্বাচিত জমির আশপাশের জমিতে ঐ নির্দিষ্ট বীজ ফসলের অন্য জাতের আবাদ না করা;
- ৩) বীজ উৎপাদনের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে বীজ সংগ্রহ করা;
- ৪) বীজের চারা বৃদ্ধিকালে জমি থেকে ভিন্ন জাতের গাছ তুলে ফেলা;
- ৫) বীজের ক্ষেত ঘন ঘন পরিদর্শন করা যাতে (ক) আগাছা দমন (খ) ভিন্ন জাতের গাছ তোলা ও (গ) রোগবালাই ও পোকা-মাকড়ের উপদ্রব ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া যায়;
- ৬) ফসলের পরিপকুতার দিকে দৃষ্টি রাখা;
- ৭) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে ফসল কাটা, মাড়াই করা ও বাড়া।

#### বীজ শুকানো

বীজকে দীর্ঘায়ু ও পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বীজকে শুকানো প্রয়োজন। বীজের জীবনীশক্তি ও অক্সুরোদগম ক্ষমতা বাড়াতে বীজ শুকানোর কোনো বিকল্প নেই। প্রকৃতপক্ষে বীজের আর্দ্রতা একটি স্ট্যাণ্ডার্ড মাত্রায় আনার জন্যই বীজ শুকানো হয়। ক্ষেত থেকে যখন ফসল কাটা হয় তখন এর আর্দ্রতা থাকে ১৮% থেকে ৪০% পর্যন্ত। এই আর্দ্রতা বীজের জীবনীশক্তি নষ্ট করে ফেলে। তাই বীজকে পরবর্তী মৌসুমে ব্যবহারের নিমিত্তে বীজের আর্দ্রতাকে ১২% বা তার নিচে নামিয়ে আনা আবশ্যিক। আর এ জন্যই বীজ শুকানোর প্রয়োজন হয়।

#### বীজ শুকানোর পদ্ধতি

দুই প্রকারে বীজ শুকানো যায়। যথা: (১) প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক বাতাসে শুকানো এবং (২) উত্তপ্ত বাতাসে শুকানো।

বীজের চারিপার্শ্বস্থ বাতাসের আর্দ্রতা যদি বীজের আর্দ্রতা থেকে বেশি হয় তবে বাতাস থেকে আর্দ্রতা বীজের মধ্যে প্রবেশ করে যতক্ষণ পর্যন্ত না বীজ ও বাতাসের আর্দ্রতা সমান হয়। বীজের আর্দ্রতা প্রয়োজনীয় মাত্রায় রাখতে হলে চারিপার্শ্বস্থ বাতাসকে শুকনো রাখা প্রয়োজন।

বীজ শুকানোর সময় নির্ভর করে (১) বীজের আর্দ্রতার মাত্রা (২) বাতাসের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার মাত্রা (৩) বাতাসের গতি এবং (৪) বীজের পরিমাণের উপর।



মনে রাখতে হবে যে, (১) বেশি তাপমাত্রায় বীজ শুকালে বীজের সমুহ ক্ষতি হয়। যেমন- বীজের জীবনীশক্তি ও অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা হ্রাস পায়। (২) অপরিষ্কার তাপে বীজ শুকালেও একই রকম ক্ষতি হয়। অর্থাৎ বীজের জীবনীশক্তি ও অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা হ্রাস পায়।

পরিমিত তাপে দক্ষতার সাথে বীজ শুকালে-

- সর্বোচ্চ মানের বীজ পাওয়া যায়।
- বীজ দীর্ঘকাল সংরক্ষণ করা যায়।
- বীজের ব্যবসায় আর্থিক লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

### বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ

ফসল কাটার পর ফসলের দানাকে বীজে পরিণত করা এবং পরবর্তী বপনের পূর্ব পর্যন্ত বীজের উন্নতমান ও অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাকে বজায় রাখার জন্য বীজের সর্বপ্রকার পরিচর্যাকে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ বলে। বীজ শুকিয়ে মান ও আকার অনুযায়ী ভাগ করা এবং সর্বশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণের গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপ।

বীজকে সুস্থভাবে প্রক্রিয়াজাত করলে যে সুফল পাওয়া যায়-

- ১) বীজের বিশুদ্ধতা বৃদ্ধি পায়;
- ২) বীজ দেখতে আকর্ষণীয় হয়;
- ৩) বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বাড়ে।

### বীজের মান নিয়ন্ত্রণ

বীজের মান নিয়ন্ত্রণ বলতে কৃষিতাত্ত্বিক কলাকৌশল প্রয়োগ করে বীজ উৎপাদন হয়েছে কি না, সঠিকভাবে ফসল কর্তন, মাড়াই ও ঝাড়াই হয়েছে কি না, সঠিকভাবে বীজ শুকিয়ে নির্দিষ্ট আর্দ্রতায় আনা হয়েছে কি না বোঝায়। প্রতিটি কাজেই বীজের গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণের সুযোগ রয়েছে।

বীজের মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একটি বীজের নমুনার মধ্যে (১) বিশুদ্ধ বীজ (২) ঘাসের বীজ (৩) অন্যান্য শস্যের বীজ ও (৪) পাথর থাকে। এদের মধ্যে বিশুদ্ধ বীজের শতকরা হার বের করাই বীজের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা।

### বীজের অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা

নমুনা বীজের শতকরা কতটি বীজ গজায় তা বের করাই বীজের অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা। যখন বীজের আর্দ্রতা ৩৫-৬০% বা তার উপর হয় তখন অঙ্কুরোদগম শুরু হয়। এর হার শতকরায় প্রকাশ করা হয়। ১০০টি বীজ গুণে একটি বেলে মাটিপূর্ণ মাটির পাত্রে রেখে পানি দ্বারা ভিজিয়ে রাখতে হবে। প্রতিদিন দেখতে হবে পানি যেন শুকিয়ে না যায়। নির্ধারিত সময় পরে বীজের অঙ্কুরোদগম শুরু হবে। যতটি বীজ গজাবে ততটি হবে বীজের অঙ্কুরোদগম হার।

### বীজের আর্দ্রতা পরীক্ষা

বীজ থেকে আর্দ্রতা বের করে দিয়ে তাতে কতটুকু আর্দ্রতা আছে তা জানার পদ্ধতিকে বীজের আর্দ্রতা পরীক্ষা বলা হয়। তা শতকরা হারে নিম্নোক্ত সূত্র দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\text{সূত্র: আর্দ্রতার শতকরা হার} = \frac{\text{নমুনা বীজের ওজন} - \text{নমুনা বীজ শুকানোর পর ওজন}}{\text{নমুনা বীজের ওজন}} \times 100$$

### বীজের জীবনীশক্তি পরীক্ষা

এই পরীক্ষার জন্য বীজ গজানোর একটি প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করা হয়। এই প্রতিকূল অবস্থায় যে বীজ বেশি গজাবে সে বীজেরই জীবনীশক্তি বেশি বলে প্রতীয়মান হবে।

### বীজ বিপণন

বীজ বিপণন বীজ প্রযুক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। বীজ বিপণন বলতে বীজ সংগ্রহ, প্যাকেজ করা, বিক্রিপূর্ব সংরক্ষণ, বিজ্ঞপ্তি, বিক্রি এসব কাজকে এককথায় বিপণন বলে। বীজ বিপণনকালে ক্রেতাদের নিম্নোক্ত তথ্য প্রদান করতে হবে।

- বীজের জাত নির্ধারণ
- বীজের পরিমাণ নির্ধারণ
- বীজ অনুমোদনপ্রাপ্ত বা প্রত্যায়িত কি না
- বীজের অঙ্কুরোদগমের হার
- বীজের বিশুদ্ধতার হার
- বীজের আর্দ্রতা
- বীজের জীবনকাল
- বীজ উৎপাদনকারী সংস্থার নাম
- বীজ অনুমোদন সংস্থার নাম
- বীজ বপনের পদ্ধতি
- সংরক্ষণের নির্দেশ
- বীজের মূল্য

### বীজ সংরক্ষণের গুরুত্ব

বীজ ভীষণ অনুভূতিগ্রন্থ। একটু অসতর্কতার জন্য বিপুল পরিমাণে বীজ নষ্ট হয়। কৃষকেরা তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বীজ সংরক্ষণ করেন। একটাই উদ্দেশ্য সামনের মৌসুমে যাতে সুস্থ-সবল বীজ বাজারে বিক্রি করতে পারেন। কিন্তু তবুও কীভাবে বীজের জীবনীশক্তি যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ রেখেই বীজ সংরক্ষণের পদ্ধতির উদ্ভাবন হয়েছে। ফসল বাছাই মাড়াই ও পরিবহনকালেই বীজ বেশি নষ্ট হয়। ইঁদুর, পাখি, ছত্রাক, আর্দ্রতা ইত্যাদির কারণে প্রায় দশ ভাগ ফসল নষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত বীজের সাথে ধূলাবালি, নুড়ি পাথরও বীজের গুণাগুণ নষ্ট করে।

বীজ সংরক্ষণের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো বীজের গুণগতমান রক্ষা করা এবং যেসব বিষয় বীজকে ক্ষতি করতে পারে সেগুলো সম্পর্কে সতর্ক হওয়া ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা।

### বীজ সংরক্ষণের পদ্ধতি

বাংলাদেশে বীজ সংরক্ষণের অনেক পদ্ধতি আছে। এক এক ফসলের বীজের জন্য এক এক রকম পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যেমন দানাজাতীয় শস্য- ধান, গম, ভুট্টা, বীজের জন্য ধানগোলা, ডোল মাটির পাত্র, চটের বস্তা, পলি ব্যাগ ও বেড ব্যবহার করা হয়। নিম্নে ফসল সংরক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

### বীজ শুকানো ও চটের বস্তায় সংরক্ষণ

বীজ শুকানো অর্থ হচ্ছে বীজ থেকে অতিরিক্ত আর্দ্রতা সরানো এবং পরিমিত মাত্রায় আনা। আর্দ্রতার মাত্রা ১২-১৩% হলে ভালো হয়। বাংলাদেশে বীজ শুকানো হয় রোদে বা সূর্যতাপে। এই আর্দ্রতা ১২-১৩ শতাংশ নামাতে বীজগুলোকে প্রায় তিন দিন প্রথর রোদে শুকাতে হয়। ঠিকমতো শুকিয়েছে কিনা তা বীজে কামড় দিয়ে পরখ করতে হবে। বীজে কামড় দেওয়ার পর যদি 'কট' করে আওয়াজ হয় তবে মনে করতে হবে বীজ ভালোমতো শুকিয়েছে। অতঃপর বীজগুলোকে চটের বস্তায় নিয়ে গোলা ঘরে রাখা হয়। বীজ পোকার উপদ্রব থেকে রক্ষার জন্য বীজের বস্তায় নিমের পাতা, নিমের শিকড়, আপেল বীজের গুঁড়া, বিশকাটালি ইত্যাদি মেশানো হয়।

### ধান গোলায় সংরক্ষণ

ধান সংরক্ষণের জন্য ধানের গোলা ব্যবহার হয়ে থাকে। ধানগোলায় আয়তন বীজের পরিমাণের উপর নির্ভর করে নির্মাণ করা হয়। বীজ রাখার আগে ধানগোলায় ভিতরে ও বাইরে গোবর ও মাটির মিশ্রণের প্রলেপ দিয়ে বীজ রাখার উপযুক্ত করতে হবে। বীজগুলো এমনভাবে ভরতে হবে যেন এর ভিতর কোনো বাতাস না থাকে। সেই জন্য ধানগোলায় মুখ বন্ধ করে এর উপর গোবর ও মাটির মিশ্রণের প্রলেপ দিতে হবে।

### ডোলে সংরক্ষণ

ডোল আকারে ধানগোলায় চেয়ে ছোট। ডোল ধানগোলায় চেয়ে কম ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন বীজ পাত্র। এটি বাঁশ বা কাঠ দিয়ে গোলাকার করে তৈরি করা হয়। ধানগোলায় মতোই ডোলের বাইরে ও ভিতরে গোবর ও মাটির মিশ্রণের প্রলেপ দিয়ে ভালোভাবে শুকিয়ে বীজ রাখার উপযুক্ত করা হয়।



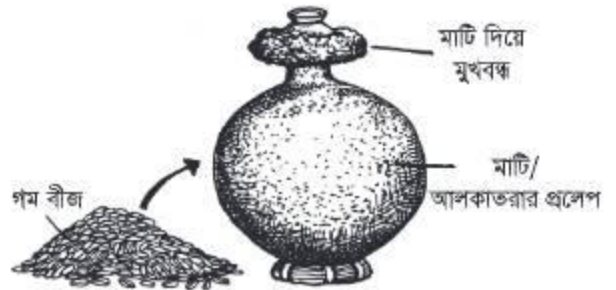
চিত্র : ডোলে বীজ সংরক্ষণ

### পলিথিন ব্যাগে সংরক্ষণ

আজকাল পাঁচ কেজি ধারণক্ষমতাসম্পন্ন পলিথিন ব্যাগে বীজ সংরক্ষণ করা হয়। এই ব্যাগ আরডিআরএস কর্তৃক উদ্ভাবিত। সাধারণ পলিথিনের চেয়ে বীজ রাখার পলিথিন অপেক্ষাকৃত মোটা হয়। শুকনো বীজ এমনভাবে পলিথিন ব্যাগে রাখতে হবে যাতে কোনো ফাঁক না থাকে এবং ব্যাগ থেকে সম্পূর্ণ বাতাস বেরিয়ে আসে। অতঃপর ব্যাগের মুখ তাপের সাহায্যে এমনভাবে বন্ধ করতে হবে যেন বাইরে থেকে ভিতরে বাতাস প্রবেশের সুযোগ না থাকে।

### মটকায় সংরক্ষণ

মটকা মাটি নির্মিত একটি গোলাকার পাত্র। গ্রাম বাংলায় এটি বহুল পরিচিত। এটি বেশ পুরু এবং মজবুত। মটকার বাইরে মাটি বা আলকাতরার প্রলেপ দেওয়া হয়। গোলা ঘরের মাচার নির্দিষ্ট স্থানে মটকা রেখে এর ভিতর শুকনো বীজ পুরোপুরি ভর্তি করা হয়। অতঃপর ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে উপরে মাটির প্রলেপ দিয়ে বায়ুরোধক করা হয়।



চিত্র : মাটির কলসে বীজ সংরক্ষণ

বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থীরা মাটির কলসে কীভাবে বীজ সংরক্ষণ করে সে পদ্ধতি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।



## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

### খাদ্য সংরক্ষণ

#### মাছের খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

মাছ চাষকে লাভজনক করতে হলে প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি মাছকে বাইরে থেকে দেওয়া সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়। আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষে যা খরচ হয় তার প্রায় শতকরা ৬০ ভাগই খরচ হয় খাদ্য ক্রয় করতে। সম্পূরক খাদ্য হিসাবে আমাদের দেশে সচরাচর যে উপাদানগুলো ব্যবহার করা হয় তা হলো- চালের কুঁড়া, গমের ভুসি, সরিষার খৈল, তিলের খৈল, ফিশমিল, গরু-ছাগলের রক্ত ও নাড়ি-ভুঁড়ি, জলজ উদ্ভিদ যেমন-কচুরিপানা, খুদিপানা ইত্যাদি। এসব উপাদান প্রয়োজনমতো মিশ্রিত করে চাষিরা মৎস্য খাদ্য তৈরি করে। কারখানায় তৈরি বাণিজ্যিক খাদ্যও মৎস্য খামারে ব্যবহার করা যায়। যে ধরনের খাদ্যই মাছ চাষের পুকুরে ব্যবহার করা হোক না কেন তার গুণগতমান ভালো হওয়া আবশ্যিক। খাবারের গুণগতমান ভালো না হলে সুস্থসবল পোনা ও মাছ হবে না, মাছ সহজেই রোগাক্রান্ত হবে এবং মাছের মৃত্যুহার অনেক বেড়ে যাবে। আবার মাছের বৃদ্ধিও আশানুরূপ হবে না। খাদ্যের গুণগতমান ভালো রাখার জন্য যথাযথ নিয়মে খাদ্য উপকরণ বা তৈরি খাদ্য সংরক্ষণ ও গুদামজাতকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিম্নলিখিত নিয়ামকসমূহ খাদ্য সংরক্ষণ ও গুদামজাতকরণের সময় খাদ্যের গুণগতমান এবং ওজনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে

- ১। খাদ্যের আর্দ্রতা : খাদ্যে আর্দ্রতার পরিমাণ ১০% এর বেশি থাকলে ছত্রাক বা পোকা-মাকড় জন্মাতে পারে।
- ২। বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা : বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬৫% এর বেশি থাকলে খাদ্যে ছত্রাক বা পোকা-মাকড় জন্মাতে পারে।
৩. তাপমাত্রা : অতিরিক্ত তাপমাত্রায় খাদ্যের পুষ্টিমান নষ্ট হয়। পোকা-মাকড়সমূহ ২৬-৩০° সে. তাপমাত্রায় খুব ভালো জন্মাতে পারে এবং এরা খাদ্য খেয়ে ফেলে ও তাদের মলমূত্র দ্বারা ব্যাকটেরিয়া ছড়াতে পারে।
- ৪। সূর্যালোক : সূর্যালোকে খোলা অবস্থায় খাদ্য রাখলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে কিছু কিছু ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়।
- ৫। অক্সিজেন : খোলা অবস্থায় খাদ্য রাখলে বাতাসের অক্সিজেন খাদ্যের রেসিডিটি (চর্বির জারণ ক্রিয়া) ঘটাতে পারে যা খাদ্যের গুণগতমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অক্সিজেন ছত্রাক ও পোকা-মাকড় জন্মাতেও সহায়তা করে।

#### সঠিক খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি

##### ক) শুকনো খাদ্য ও খাদ্য উপাদান

- ১) খাদ্য বায়ুরোধী পলিথিনের বা চটের অথবা কোনো মুখ বন্ধ পাত্রে ঠাণ্ডা ও শুষ্ক জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। মাঝে মাঝে এই খাদ্য পুনরায় রোদে শুকিয়ে নিলে ভালো হয়।
- ২) খাদ্য পরিষ্কার, শুকনো, নিরাপদ এবং পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ঘরে রাখতে হবে।

- ৩) গুদাম ঘরে সংরক্ষিত খাদ্য মেঝেতে না রেখে ১২ থেকে ১৫ সেমি উপরে কাঠের পাটাতনে রাখতে হবে।
- ৪) পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণের জন্য খাদ্যের বস্তার নিচে এবং আশপাশে ছাই ছিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে।
- ৫) খাদ্য তিন মাসের বেশি গুদামে রাখা যাবে না। এর মধ্যেই এটি ব্যবহার করে ফেলা উচিত।
- ৬) ইঁদুর বা অন্যান্য প্রাণীর উপদ্রবমুক্ত স্থানে খাদ্য সংরক্ষণ করতে হবে।
- ৭) খাদ্য কীটনাশক ও অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থের সাথে রাখা যাবে না।

#### খ) আর্দ্র/ভেজা খাদ্য উপাদান

- ১) খাদ্য তৈরির জন্য তাজা ছোট মাছ হলে তাৎক্ষণিক খাওয়াতে হবে, অন্যথায় রেফ্রিজারেটরে রেখে দিতে হবে।
- ২) তৈলাক্ত/চর্বিযুক্ত খাদ্য কালো রঙের বা অস্বচ্ছ পাত্রে নির্ধারিত তাপমাত্রায় রেখে দিতে হবে।
- ৩) ভিটামিন ও খনিজ লবণসমূহ বাতাস এবং আলোকবিহীন পাত্রে রেফ্রিজারেটরে রেখে দিতে হবে।

কাজ: শিক্ষার্থীরা খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি আলোচনা করবে এবং পোস্টার পেপারে উপস্থাপন করবে।

#### নতুন শব্দ: রেপিডিটি

#### পশুপাখির খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও সংরক্ষণ পদ্ধতি

কোনো খাদ্যের গুণাগুণ ও পুষ্টিমান ঠিক রেখে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য খাদ্যকে প্রক্রিয়াজাত করে রেখে দেওয়াকে খাদ্য সংরক্ষণ বলে। আবার তৈরি করা পশুখাদ্যের গুণাগুণ ঠিক রাখার জন্যও গুদামজাত করার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়।

#### খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশে প্রাপ্ত গবাদি পশুর খাদ্যের বেশির ভাগ কৃষি শস্যের উপজাত। এসব উপজাত শস্য মাড়াই বা শস্যদানা প্রক্রিয়াজাত করার পর পাওয়া যায়। বর্ষা মৌসুমে অনেক ঘাস উৎপাদিত হওয়ায় তা গবাদি পশুকে খাওয়ানোর পরও অতিরিক্ত থেকে যায়। আবার শীতকালেও অতিরিক্ত শিম গোত্রীয় ঘাস উৎপাদন হয়। তাই এই অতিরিক্ত ঘাস সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। যখন ঘাসের অভাব হয় তখন এই সংরক্ষিত ঘাস গবাদি পশুকে সরবরাহ করা হয়। খাদ্য সংরক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে খাদ্যকে রোগজীবাণু ও পচনের হাত থেকে রক্ষা করা। পশুপাখির দানাদার খাদ্যকে আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রিত কক্ষে সংরক্ষণ করে বেশি দিন গুণাগুণ ঠিক রেখে সংরক্ষণ করা যায়। খাদ্যের আর্দ্রতা বেশি হলে এতে ছত্রাক জন্মায়। ছত্রাক জন্মানো খাদ্য খেলে পশুপাখির দেহে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ফলে অনেক সময় পশু অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

#### খাদ্য সংরক্ষণের উপায়ের বিভিন্ন ধাপসমূহ

ক) হে তৈরির মাধ্যমে সবুজ ঘাস সংরক্ষণ করা হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে হে তৈরি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তবুও নিম্নে হে তৈরির বিভিন্ন ধাপগুলো দেওয়া হলো -

- ১। হে তৈরির জন্য শিম গোত্রীয় ঘাস যেমন, সবুজ খেসারি, মাসকলাই বেশি উপযোগী।

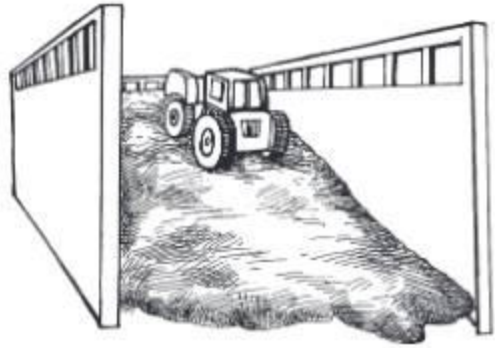
- ২। ফুল আসার সময় ঘাস কাটতে হয়।
- ৩। ঘাস রোদে শুকিয়ে আর্দ্রতা ১৫-২০% এর মধ্যে রাখা হয়।
- ৪। ঘাস শুকিয়ে মাচার উপর স্তূপাকারে বা চালাযুক্ত ঘরে সংরক্ষণ করা হয়।

খ) সাইলেজ তৈরির মাধ্যমে সবুজ ঘাস সংরক্ষণ করা হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাইলেজ তৈরি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তবুও নিম্নে সাইলেজ তৈরির ধাপগুলো দেওয়া হলো-

- ১। সাইলেজ তৈরির জন্য ভুট্টা, নেপিয়র, গিনি ঘাস বেশি উপযোগী।
- ২। ফুল আসার সময় রসাল অবস্থায় ঘাস কাটতে হয়।
- ৩। ঘাস কেটে বায়ুনিরোধক স্থানে বা সাইলো পিটে রাখা হয়।
- ৪। সাইলো পিটে ঘাস রাখার সময় ঝোলাগুড়ের দ্রবণ ছিটিয়ে দিতে হয়।
- ৫। তারপর বায়ু চলাচল বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।



চিত্র : সাইলেজ তৈরির জন্য ভুট্টা কাটার উপযুক্ত অবস্থা



চিত্র : সাইলো পিটে সবুজ ঘাস পরিপূর্ণ করা হচ্ছে

- গ) খড় তৈরির মাধ্যমে ফসলের বর্জ্য সংরক্ষণ করা হয়। আমাদের দেশে বেশির ভাগ কৃষক পরিবারে গরুর জন্য খাদ্য হিসাবে খড় ব্যবহার করা হয়। গরুকে দৈনিক ৩-৪ কেজি শুকনো খড় দেওয়া হয়। এটি আংশজাতীয় খাদ্য। নিম্নে খড় তৈরির ধাপগুলো দেওয়া হলো-
- ১। শস্যগাছ (ধান, ভুট্টা, খেসারি ইত্যাদি গাছ) ক্ষেত থেকে কাটার পর সেগুলো মাড়াই করে শস্যদানা আলাদা করে ফেলা হয়।
- ২। বর্জ্য গাছগুলো রোদে শুকিয়ে আর্দ্রতা ১৫-২০% এর মধ্যে এনে খড় তৈরি করা হয়।
- ৩। খড় সাধারণত গাদা করে রাখা হয়।
- ঘ) দানাশস্য ও তৈলবীজের উপজাত সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা হয়। ধান, গম, ভুট্টা, খেসারি, কলাই ইত্যাদি দানাশস্যের উপজাতসমূহ যেমন, চালের কুঁড়া, গমের ভুসি, ডালের খোসা, খেল ইত্যাদি সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা হয়।
- ঙ) কারখানায় প্রক্রিয়াজাত করে খাদ্য সংরক্ষণ করা হয়। যেমন, পোল্ট্রির জন্য দানাদার খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করে মেশ, পিলেট ও ক্রাম্বল ফিড তৈরি করা হয়।



## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

### সম্পূরক খাদ্য: মাছ ও গবাদিপশু

মাছের সম্পূরক খাদ্যের পরিচিতি ও প্রয়োজনীয়তা

দেহের বৃদ্ধি ও বেঁচে থাকার জন্য মাছ পুকুরের প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে ফাইটোপ্লাংকটন (উদ্ভিদকণা), জু-প্লাংকটন (প্রাণিকণা) খুঁদিপানা, ছোট জলজ পতঙ্গ, পুকুরের তলদেশের কীট, লার্ভা, কেঁচো, ছোট ছোট শামুক, বিনুক, মৃত জৈব পদার্থ ইত্যাদি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। কিন্তু মাছ চাষের ক্ষেত্রে অধিক উৎপাদন পাওয়ার জন্য পুকুরে অধিক ঘনত্বে পোনা ছাড়া হয়। এ অবস্থায় শুধু প্রাকৃতিক খাদ্য মাছের দ্রুত বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক উৎপাদন পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। এমনকি সার প্রয়োগ করে প্রাকৃতিক খাদ্য বৃদ্ধি করলেও তা যথেষ্ট হয় না। এজন্য প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি মাছকে বাইর থেকে অতিরিক্ত খাদ্য দিতে হয়। একে সম্পূরক খাদ্য বলে। যেমন-চালের কুঁড়া, সরিষার খৈল, ফিশ মিল ইত্যাদি। গ্রাসকার্প ও সরপুঁটি মাছ উদ্ভিদভোজী বলে এদের জন্য খুঁদিপানা, কুঁটিপানা, শাকসবজির নরম পাতা, ঘাস কেটে সম্পূরক খাবার হিসাবে পুকুরে দেওয়া যায়। মাছকে সরবরাহকৃত সম্পূরক খাদ্যে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান যেমন-আমিষ, স্নেহ বা তেল, শর্করা, খনিজ লবণ ও ভিটামিনের মাত্রা যেন চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মাত্রায় থাকে সেদিকে লক্ষ রাখা প্রয়োজন। যে সম্পূরক খাবার এ সকল পুষ্টি উপাদান যথাযথ মাত্রায় রেখে তৈরি করা হয় তাকে সুষম সম্পূরক খাদ্য বলে।

মাছের সম্পূরক খাদ্যের উৎস

মাছের সম্পূরক খাদ্য তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উপাদান ব্যবহার করা হয়। উৎসের উপর ভিত্তি করে এসব উপাদানকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ক) উদ্ভিদজাত খ) প্রাণিজাত। নিচে এদের কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো-

ক) উদ্ভিদজাত : উদ্ভিদজাত খাদ্য উপাদানের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য উপাদান হচ্ছে- চালের কুঁড়া, গম ও ডালের মিহিভুসি, সরিষার খৈল, তিলের খৈল, আটা, চিটাগুড়, খুঁদিপানা, রান্না ঘরের উচ্ছিষ্ট, বিভিন্ন নরম পাতা যেমন- মিষ্টিকুমড়া, কলাপাতা, বাঁধাকপি ইত্যাদি।

খ) প্রাণিজাত : প্রাণিজাত কয়েকটি খাদ্য উপাদান হচ্ছে গুটিকি মাছের গুঁড়া বা ফিশমিল, রেশম কীট মিল, চিহড়ির গুঁড়া (সিম্প মিল), কাঁকড়ার গুঁড়া, হাড়ের চূর্ণ (বোন মিল), শামুকের মাংস, গবাদি পশুর রক্ত (ব্লাড মিল) ইত্যাদি।

সম্পূরক খাদ্যের উপকারিতা

- ১। মাছকে নিয়মিত সম্পূরক খাবার সরবরাহ করলে অধিক ঘনত্বে পোনা ও বড় মাছ চাষ করা যায়।
- ২। অল্প সময়ে বড় আকারের সুস্থ-সবলপোনা উৎপাদন করা যায়।

- ৩। পোনার বাঁচার হার বেড়ে যায়।
- ৪। মাছের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- ৫। মাছের দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে।
- ৬। মাছ পুষ্টির অভাবজনিত রোগ থেকে মুক্ত থাকে।
- ৭। সর্বোপরি কম সময়ে জলাশয় থেকে অধিক মাছ ও আর্থিক মুনাফা পাওয়া সম্ভব হয়।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা সহজলভ্য কয়েকটি খাদ্য উপাদান সংগ্রহ করবে এবং উপাদানের নাম খাতায় লিখবে।

### মাছের পুষ্টি চাহিদা ও সম্পূরক খাদ্য তালিকা

মাছের প্রজাতি, বয়স ও আকারের উপর ভিত্তি করে খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা বিভিন্ন হয়। প্রজাতি ভেদে বিভিন্ন মাছের রেগু পোনার জন্য দেহের ওজনের ১০-২০%, আঙুলে পোনার জন্য ৫-১০% এবং বড় মাছের জন্য ৩-৫% হারে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়। সুস্থ-সবল মাছ ও এর দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধির জন্য মাছের খাবারে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান থাকা আবশ্যিক। এসব উপাদানের মধ্যে আমিষ বা প্রোটিন গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যয়বহুল। এটি খাবারে বেশি মাত্রায় প্রয়োজন। এজন্য মাছের পুষ্টি চাহিদা বলতে প্রধানত আমিষের চাহিদাকে বোঝায়। মাছের খাদ্য তৈরিতে ব্যবহৃত উপাদান যেমন-শর্করা, তেল ও খনিজ লবণ কম বেশি বিদ্যমান থাকে। এসব খাদ্যে আমিষের চাহিদা পূরণ হলে অন্যান্য পুষ্টি উপাদানগুলোর খুব একটা অভাব হয় না। খাদ্যে আমিষের এই চাহিদা প্রজাতি ও জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তর ভেদে কার্প বা বুই জাতীয় মাছের জন্য ২০-৩০%, চিংড়ির জন্য ৩০-৪৫% ও ক্যাটফিশ (আঁশবিহীন লম্বা গুঁড়যুক্ত মাছ) বা মাগুর জাতীয় মাছের জন্য ৩৫-৪৫% থাকে।

একটি পুকুরে সম্পূরক খাদ্য প্রদানের মাধ্যমে যখন মাছ উৎপাদন করা হয়, তখন ঐ খাদ্য কী পরিমাণ মাছ দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে (মাছ খাচ্ছে) এবং তা থেকে কী পরিমাণ মাছ উৎপাদন হচ্ছে, তা খাদ্য রূপান্তর হার বা FCR (Food Conversion Ratio) নির্ণয়ের মাধ্যমে হিসাব করা যায়। এভাবে একাধিক খাদ্যের FCR নির্ণয় করে তুলনা করলে কোন খাদ্য অধিক ভালো তা বোঝা যায়। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে খাদ্য রূপান্তর হার বা FCR হচ্ছে খাদ্য প্রয়োগ ও খাদ্য গ্রহণের ফলে জীবের দৈহিক বৃদ্ধির অনুপাত। অর্থাৎ ১ কেজি মাছ পেতে যত কেজি খাবার খাওয়াতে হয়, তাই খাদ্য রূপান্তর হার।

$$FCR = \frac{\text{মাছকে প্রদানকৃত খাদ্য}}{\text{দৈহিক বৃদ্ধি}}$$

দৈহিক বৃদ্ধি = আহরণকালীন মোট ওজন - মজুদকালীন মোট ওজন

ধরা যাক, একটি পুকুরে কিছু মাছের পোনা ছাড়া হলো যার মোট ওজন ১ কেজি। নিয়মিত খাদ্য প্রয়োগ করে ৬ মাস পর আহরণের সময় মোট ১৫ কেজি মাছ পাওয়া গেল। এ ৬ মাসে মোট ২১ কেজি খাদ্য প্রয়োগ করা হলো।

$$\text{সূত্রাং, FCR} = \frac{২১}{১৫ - ১} = ১.৫$$

FCR-এর মান সব সময় ১ এর চেয়ে বড় হয়। যে খাদ্যের FCR এর মান যত কম সে খাদ্যের গুণগত মান তত ভালো অর্থাৎ, সে খাদ্য ব্যবহার করে অধিক মাছ উৎপাদন করা যায়।

কার্প বা রুই জাতীয় মাছ চাষের ক্ষেত্রে নিম্নের উপাদানগুলোর মিশ্রণে সুষম সম্পূরক খাদ্য তৈরি করা যায়-

উপকরণের নাম	শতকরা হার (%)
ফিসমিল	১০-২১
সরিষার খৈল	৪৫-৫৩
চালের কুঁড়া	২৮-৩০
ভিটামিন ও খনিজ লবণ	০.৫-১.০
চিটাগুড় ও আটা	৫
মোট	১০০

### মাছের সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুতপ্রণালি

প্রথমে ভালো মানসম্পন্ন নির্ধারিত খাদ্য উপাদানসমূহ সংগ্রহ করতে হবে। উপাদানসমূহ প্রয়োজনে আটা পেয়া মেশিনে বা টেকিতে ভালো করে চূর্ণ বা গুঁড়া করে নিতে হবে এবং চালনি দিয়ে চেলে নিতে হবে। সূত্র অনুযায়ী খাদ্য উপাদানসমূহ একটি একটি করে মেপে নিয়ে মিল্লার মেশিনে বা একটি বড় পাত্রে ভালোভাবে মেশাতে হবে। মেশানো উপাদানগুলোতে পানি দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে মণ্ড তৈরি করতে হবে। এখন মণ্ড ছোট ছোট বলের মতো তৈরি করে ভেজা বা আর্দ্র খাদ্য হিসাবে মাছকে দিতে হবে। মাছকে সরবরাহকৃত খাবার পানিতে বেশি স্থিতিশীল রাখার জন্য বাইন্ডার হিসাবে আটা বা ময়দা বা চিটাগুড় ব্যবহার করা যায়। ভেজা বা আর্দ্র খাবার প্রতিদিন প্রয়োগের পূর্বে পরিমাণমতো তৈরি করতে হবে।

আবার এই মণ্ড দিয়ে সহজ পদ্ধতিতে স্বল্প মূল্যে দেশীয় পিলেট মেশিনের সাহায্যে পিলেট বা দানাদার খাবার তৈরি করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে পিলেট বা দানাদার খাবার রোদে শুকিয়ে নিতে হবে এবং পরবর্তীতে ব্যবহারের জন্য বায়ুরোধী প্লাস্টিক ব্যাগে সংরক্ষণ করতে হবে। খেলে কিছু বিস্বাক্ত উপাদান থাকে, যা মাছের জন্য ক্ষতিকর। তাই খেল একদিন পানিতে ভিজিয়ে রেখে ব্যবহার করতে হয়। খেল ভেজানো পানি মাছের খাদ্য তৈরিতে ব্যবহার করা যাবে না। সুষম খাদ্য তৈরির জন্য নির্বাচিত খাদ্য



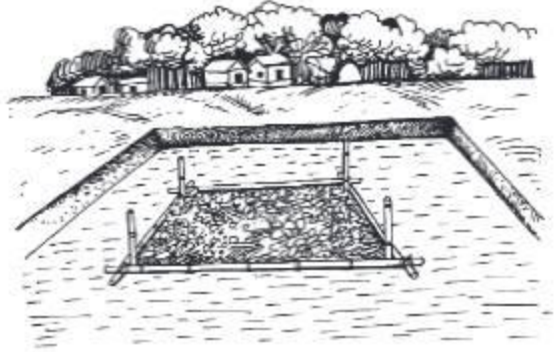
উপাদানের সাথে ০.৫-১% ভিটামিন ও খনিজ লবণের মিশ্রণ ব্যবহার করতে হবে। ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ কিনতে পাওয়া যায়।

### মাছের সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি

- ১। মাছ দিনের বেলায় খাবার গ্রহণ করে। এজন্য চাষের পুকুরে দিনের প্রয়োজনীয় খাবার সমান দুইভাগে ভাগ করে এক ভাগ সকালে এবং অন্য ভাগ বিকালে দিতে হবে। অন্যদিকে চিংড়ি নৈশভোজী বলে এদেরকে সন্ধ্যায় বা রাতে খাবার দিতে হয়।
- ২। প্রজাতি ভেদে বিভিন্ন মাছের রেণু পোনার জন্য দেহের ওজনের ১০-২০%, আঙুলে পোনার জন্য ৫- ১০% এবং বড় মাছের জন্য ৩-৫% হারে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়। পোনা মাছ চাষের ক্ষেত্রে সপ্তাহে ১ বার এবং মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে ১৫ দিন বা মাসে ১ বার জাল টেনে কয়েকটি মাছের গড় ওজন নিয়ে পুকুরে সর্বমোট যতটি মাছ ছাড়া হয়েছিল তা দিয়ে গুণ করলে পুকুরে মোট মাছের ওজন পাওয়া যাবে। এভাবে দৈনিক বৃদ্ধির সাথে সমন্বয় করে খাবারের পরিমাণ ঠিক করে নিতে হবে।
- ৩। পুকুরে গ্রাসকার্প ও সরপুটি চাষ করা হলে এদেরকে খুদিপানা, কুটিপানা, সবুজ ঘাস, হেলেঞ্চা, কচুরিপানার নরম অংশ ও বিভিন্ন উদ্ভিদের পাতা যেমন-বাঁধাকপি, পুঁইশাক, কলাপাতা কেটে পুকুরে সরবরাহ করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে বাঁশের টুকরা বা গাছের ডালদিয়ে বর্গাকারের একটি ফ্রেম তৈরি করতে হবে। ফ্রেমটি একটি খুঁটির সাহায্যে পুকুরের পানিতে স্থাপন করতে হবে যেন এটি সব সময় একই স্থানে থাকে। এই ফিডিং ফ্রেম বা রিং-এ উপরোক্ত খাদ্য দিতে হবে। মাঝে মাঝে এটি পরিষ্কার করতে হবে।
- ৪। শুকনো খাবার পানির উপরে ছিটিয়ে এবং আর্দ্র বা ভেজা খাবার পানির ৩০-৬০ সেমি নিচে স্থাপিত খাদ্যদানি, ট্রে বা মাচায় প্রয়োগ করতে হবে। এতে খাদ্যের অপচয় কম হবে।
- ৫। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে পুকুরের চারপাশে ৩-৪ টি নির্দিষ্ট স্থানে খাবার দিতে হবে। এতে করে খাদ্যের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে।
- ৬। শীতকালে মাছের বৃদ্ধি কম হয় বলে খাদ্য প্রয়োগের হার স্বাভাবিকের চেয়ে অর্ধেক বা তিন ভাগের এক ভাগ কমিয়ে আনতে হয়।
- ৭। পুকুর অত্যধিক সবুজ হয়ে গেলে খাবার প্রয়োগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে।
- ৮। খাদ্য প্রয়োগের যথেষ্ট সময় পর খাবার থেকে গেলে বুঝতে হবে খাদ্যের পরিমাণ বেশি হয়েছে। সেক্ষেত্রে খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে।



চিত্র: খাদ্যদানি বা ট্রে



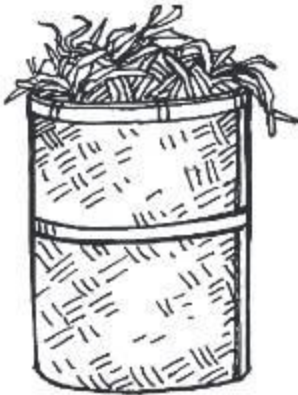
চিত্র: ফিডিং ফ্রেম/রিং

কাজ : শিক্ষার্থীরা নিকটস্থ যেকোনো মৎস্য খামারে গিয়ে মাছের সম্পূর্ণ খাদ্য তৈরি করা এবং প্রয়োগ পদ্ধতি দেখে প্রতিবেদন লিখে জমা দেবে।

নতুন শব্দ : ব্লাড মিল, বোন মিল, সিম্প মিল, ফিডিং ফ্রেম/রিং, খাদ্যদানি, খাদ্যরূপান্তর হার (FCR)

পশুপাখির সম্পূর্ণ খাদ্য

পশুপাখির উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এদেরকে প্রচলিত খাবারের সাথে বিশেষ খাদ্য সরবরাহ করা হয়। এতে পশুপাখির দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে এবং পরিপুষ্টি লাভ করে। পশুপাখির মাংস, ডিম ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তাই পশুপাখি পালনে সম্পূর্ণ খাদ্যের অধিক গুরুত্ব রয়েছে।



চিত্র : ইউরিয়া মিশ্রিত পানি দ্বারা ভেজা খড়



চিত্র : ইউরিয়া মিশ্রিত পানি খড়ে মেশানো হচ্ছে

বিভিন্ন সম্পূরক খাদ্য তৈরি ও প্রয়োগ পদ্ধতি-

ক) ইউরিয়া মোলাসেস খড় : ইউরিয়ার সাহায্যে খড় প্রক্রিয়াজাতকরণ -

উপকরণ

খড় : ২০ কেজি,

ইউরিয়া : ১ কেজি,

পানি : ২০ লিটার,

একটি মাঝারি আকারের পাত্র, বস্তা ও মোটা পলিথিন।

তৈরির পদ্ধতি

- ১। প্রথমে একটি বালতিতে ১ কেজি ইউরিয়া ২০ লিটার পানিতে মিশিয়ে নিতে হবে।
- ২। ডোলের চারদিকে গোবর ও কাদা মিশিয়ে লেপে শুকিয়ে নিতে হবে।
- ৩। এবার ডোলের মধ্যে অল্প অল্প খড় দিয়ে ইউরিয়া মেশানো পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।
- ৪। সমস্ত খড় সম্পূর্ণ পানি দ্বারা মিশিয়ে ডোলের মুখ বস্তা ও মোটা পলিথিন দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।
- ৫। দশ দিন পর খড় বের করে রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রয়োগ পদ্ধতি

- ১। একটি গরুকে দৈনিক ২-৩ কেজি ইউরিয়া মেশানো খড় খাওয়াতে হবে।
- ২। খড়ের সাথে দৈনিক ৩০০ গ্রাম বোলাগুড় মিশিয়ে দিতে হবে।

খ) ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক : দানাদার খাদ্যের সাহায্যে ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক তৈরিকরণ -

উপকরণ

গমের ভুসি : ৩ কেজি

চিটাগুড় : ৬ কেজি

ইউরিয়া : ৯০ গ্রাম

লবণ : ৩৫ গ্রাম

খাবার চুন : ৫০০ গ্রাম

ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স : ৫০ গ্রাম এবং

কাঠের ছাঁচ (১ কেজি ব্লক তৈরির জন্য)



চিত্র : ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক তৈরির উপকরণ

তৈরির পদ্ধতি

- ১। প্রথমে একটি লোহার কড়াইতে সামান্য ভিটামিন মিনারেল মিশ্রণ চিটাগুড়সহ জ্বাল দিয়ে সামান্য ঘন করতে হবে।
- ২। কড়াই চুলা থেকে নামিয়ে এর মধ্যে ইউরিয়া, চুন, লবণ, গমের ভুসি যোগ করে ভালোভাবে মেশাতে হবে।



- ৩। এরপর ছাঁচের মধ্যে কিছু ভুসি ছিটিয়ে মিশ্রিত দ্রব্যগুলো ভরে ব্লক তৈরি করতে হবে।
- ৪। ব্লকগুলো শুকনো আলো বাতাসযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।

#### প্রয়োগ পদ্ধতি

- ১। একটি গরুকে দৈনিক ৩০০ গ্রাম ব্লক জিহ্বা দিয়ে চেটে খেতে দিতে হবে।
- ২। প্রথমে ব্লক জিহ্বা দিয়ে চেটে খেতে না চাইলে ব্লকের উপর কিছু ভুসি ও লবণ ছিটিয়ে দিতে হবে।



চিত্র : ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক

#### গ) গবাদিপশুকে অ্যালজি বা শেওলা খাওয়ানো

অ্যালজি বা শেওলা এক ধরনের উদ্ভিদ বা আকারে এককোষী থেকে বহুকোষী হতে পারে। তবে এখানে দুটি বিশেষ প্রজাতির এক কোষী অ্যালজির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা গো-খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। এদের মধ্যে প্রধান হলো ক্লোরেলা। এরা সূর্যালোক, পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জৈব নাইট্রোজেন আহরণ করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বেঁচে থাকে। এরা বাংলাদেশের মতো উষ্ণ জলবায়ুতে দ্রুত বর্ধনশীল।

#### অ্যালজির পুষ্টিমান

অ্যালজি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় পুষ্টিকর খাদ্য যা বিভিন্ন ধরনের আমিষ জাতীয় খাদ্য যেমন- খৈল, গুঁটকি মাছের গুঁড়া ইত্যাদির বিকল্প হিসাবে ব্যবহার হতে পারে। শুষ্ক অ্যালজিতে শতকরা ৫০-৭০ ভাগ আমিষ, ২০-২২ ভাগ চর্বি এবং ৮-২৬ ভাগ শর্করা থাকে। এছাড়াও অ্যালজিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং বিভিন্ন ধরনের বি ভিটামিন থাকে। অ্যালজি পানি ব্যবহার করে কম খরচে গরুর মাংস এবং দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

#### অ্যালজি চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ

অ্যালজির বীজ, কৃত্রিম অগভীর পুকুর বা জলাধার, পরিষ্কার স্বচ্ছ পানি, মাগকলাই বা অন্যান্য ডালের ভুসি ও ইউরিয়া

#### অ্যালজির উৎপাদন পদ্ধতি

- ১। প্রথমে সমতল ও ছায়াযুক্ত জায়গায় একটি কৃত্রিম জলাধার তৈরি করতে হবে। জলাধারটি লম্বায় ৩ মিটার, চওড়ায় ১.২ মিটার এবং গভীরতায় ০.১৫ মিটার হতে পারে। এর পাড় ইট বা মাটির তৈরি হতে পারে। এবার ৩.৩৫ মিটার, ১.৫২ মিটার চওড়া একটি স্বচ্ছ পলিথিন বিছিয়ে কৃত্রিম জলাধারটির তলা ও পাড় ঢেকে দিতে হবে। তবে জলাধারটির আয়তন প্রয়োজন অনুসারে ছোট বা বড় হতে পারে। তাছাড়া মাটির বা সিমেন্টের চাড়িতে অ্যালজি চাষ করা যায়।

- ২। এরপর ১০০ গ্রাম মাসকলাই বা অন্য ডালের ভূসিকে ১ লিটার পানিতে সারা রাত ভিজিয়ে কাপড় দিয়ে ছেকে পানিটুকু সংগ্রহ করতে হবে।
- এভাবে একই ভূসিকে অন্তত তিনবার ব্যবহার করে পরবর্তীতে গরুকে খাওয়ানো যায়।
- ৩। এবার কৃত্রিম পুকুরে ২০০ লিটার পরিমাণ কলের পরিষ্কার পানি, ১৫-২০ লিটার পরিমাণ অ্যালজির বীজ এবং মাসকলাই ভূসি ভেজানো পানি ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর ২-৩ গ্রাম পরিমাণ ইউরিয়া নিয়ে উক্ত পুকুরের পানিতে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
- ৪। এরপর প্রতিদিন সকাল, দুপুর, বিকালে কমপক্ষে তিনবার উক্ত অ্যালজির পানিকে নেড়ে দিতে হবে। পানির পরিমাণ কমে গেলে নতুন করে পরিমাণমতো পরিষ্কার পানি যোগ করতে হবে। প্রতি ৩/৪ দিন পর পর পুকুরে ১-২ গ্রাম পরিমাণ ইউরিয়া ছিটালে ফলন ভালো হয়।
- ৫। এভাবে উৎপাদনের ১২-১৫ দিনের মধ্যে অ্যালজির পানি গরুকে খাওয়ানোর উপযুক্ত হয়। এসময় অ্যালজির পানির রং গাঢ় সবুজ বর্ণের হয়। অ্যালজির পানিকে পুকুর থেকে সংগ্রহ করে সরাসরি গরুকে খাওয়ানো যায়। প্রতি ১০ বর্গমিটার পুকুর থেকে প্রতিদিন প্রায় ৫০ লিটার অ্যালজির পানি উৎপাদন করা সম্ভব।
- ৬। একটি পুকুরের অ্যালজির পানি খাওয়ানোর পর উক্ত পুকুরে আগের নিয়ম অনুযায়ী পরিমাণমতো পানি, সার এবং মাসকলাই ভূসি ভেজানো পানি দিয়ে নতুন করে অ্যালজি চাষ শুরু করা যায়, এ সময় নতুন করে অ্যালজি বীজ দিতে হয় না।
- ৭। যখন অ্যালজি পুকুরে পানির রং স্বাভাবিক গাঢ় সবুজ রং থেকে বাদামি রং হয়ে যায় তখন বুঝতে হবে যে উক্ত কালচারটি কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে নতুন করে কালচার শুরু করতে হবে।

#### খাওয়ানো পদ্ধতি

- ১। সব বয়সের গরুকে অর্থাৎ বাছুর, বাড়ন্ত গরু, দুধের বা গর্ভবতী গাভী, হালের বলদ সবাইকে সাধারণ পানির পরিবর্তে অ্যালজির পানি খাওয়ানো যায়।
- ২। এ ক্ষেত্রে গরুকে আলাদা করে পানি খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই।
- ৩। অ্যালজি পানি দানাদার খাদ্য অথবা খড়ের সাথে মিশিয়েও খাওয়ানো যায়।
- ৪। অ্যালজির পানিকে গরম করে খাওয়ানো উচিত নয়, এতে অ্যালজির খাদ্যমান নষ্ট হতে পারে।
- ৫। খামারের ৫টি গরুর জন্য ৫টি কৃত্রিম পুকুরে অ্যালজি চাষ করতে হয় যাতে একটির অ্যালজির পানি শেষ হলে পরবর্তীটি খাওয়ানোর উপযুক্ত হয়।

ঘ) বাজারে তৈরি সম্পূরক খাদ্য : পশুপাখির উৎপাদন চলমান রাখার জন্য এদেরকে বাজারে তৈরি বিভিন্ন সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

১. আমিষ সম্পূরক খাদ্য - যেমন, প্রোটিন কনসেন্ট্রেট
২. খনিজ সম্পূরক - ভিটামিন ও খনিজ প্রিমিক্স
৩. খাদ্যপ্রাণ সম্পূরক - ভিটামিন ও খনিজ প্রিমিক্স।

### ৬) বাছুরের সম্পূর্ণ খাদ্য তালিকা-

মিল্ক রিপ্লেসার (Milk Replacer) : বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি এক ধরনের তরল পশুখাদ্য যাতে দুধের উপাদান থাকে এবং বাছুরের জন্য দুধের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়। এতে ২০% আমিষ ও ১০% এর অধিক চর্বি থাকে। এর উপাদানসমূহকে গরম স্কিম মিল্কে বা পানিতে মিশ্রিত করা হয়।

প্রয়োগ পদ্ধতি : বাছুরের বয়স অনুসারে দৈনিক ০.৫ থেকে ৩ লিটার পর্যন্ত খাওয়ানো যায়।

মিল্ক রিপ্লেসার (Milk Replacer) তৈরির একটি নমুনা নিম্নে দেওয়া হলো -

ক্রমিক	উপকরণ	রেশন-১ (%)	রেশন-২ (%)
১	স্কিম মিল্ক	৬৫	-
২	স্কিম মিল্ক পাউডার	-	৬
৩	পানি	-	৬০
৪	উদ্ভিজ্জ তেল	২০	২০
৫	ছানার দুধ	১০	৯
৬	ভিটামিন ও খনিজ প্রিমিক্স	০৫	০৫
	মোট	১০০	১০০

কাফ স্টার্টার (Calf Starter) : বাছুরের খাবার উপযোগী বিশেষ দানাদার খাদ্য মিশ্রণ যাতে ২০%-এর অধিক পরিপাচ্য আমিষ ও ১০%-এর কম আঁশযুক্ত খাদ্য থাকে। কাফ স্টার্টারের একটি নমুনা নিম্নে দেওয়া হলো -

ক্রমিক	উপকরণ	পরিমাণ (%)
১	তুলাবীজ	৩৮
২	ভুট্টা	৩০
৩	যব	১০
৪	ছানার গুঁড়া	১০
৫	গমের ভুসি	১০
৬	হাড়ের গুঁড়া	১
৭	খাদ্য লবণ	১
	মোট	১০০

কাজ : শিক্ষার্থীরা গবাদি পশুর বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের তালিকা তৈরি করবে।

প্রয়োগ পদ্ধতি : বাছুরের বয়স অনুসারে দৈনিক ০.৫ থেকে ৩ কেজি পর্যন্ত খাওয়ানো যায়।



## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন ধরনের মাটিতে আলু উৎপাদন বেশি হয়?

ক. দোআঁশ মাটিতে

খ. বেলে দোআঁশ মাটিতে

গ. পলি মাটিতে

ঘ. দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটিতে

২. উদ্ভিদভোজী মাছ নয় কোনটি?

ক. কালাবাউস

খ. মুগেল

গ. তেলাপিয়া

ঘ. সরপুটি

৩. বীজের বস্তায় পোকাকার উপদ্রব থেকে রক্ষার জন্য মেশানো হয়—

i. নিমের পাতার গুঁড়া

ii. আপেলের বীজের গুঁড়া

iii. কমলার বীজের গুঁড়া

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

তাসফি নদীর ধারের একটি জমিতে আলুর চাষ করে আসছিলেন। প্রথম দিকে তার জমি থেকে আশানুরূপ ফলন পেলেও বর্তমানে তার জমির ফলন কমে যাচ্ছে। তিনি এ বিষয়ে কৃষি কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করেন। কৃষি কর্মকর্তা তাকে জমির ঢালু অংশে ভালোভাবে আইল তৈরির পরামর্শ দেন।

৪. তাসফির জমির ফলন কমে যাওয়ার কারণ—

- i. জমির উর্বরতা হ্রাস
- ii. জৈব পদার্থের অভাব
- iii. মাটির অনুন্নত গঠন।

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

৫. কৃষি কর্মকর্তা তাসফিকে জমিতে আইল তৈরির পরামর্শ দেওয়ার কারণ কোনটি?

- ক. জমির উর্বরতা নিয়ন্ত্রণ
- খ. জমির ভূমিক্ষয় রোধ
- গ. ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি
- ঘ. মাটির গঠনের উন্নয়ন।

### সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সফিক সাহেব তার বন্ধু রফিকের জমিতে উন্নত জাতের নতুন গম দেখে চাষ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। পরবর্তী মৌসুমে চাষের জন্য তিনি তার বন্ধুর নিকট থেকে বীজ সংগ্রহ করলেন। বীজগুলোর আর্দ্রতা পরীক্ষা করার জন্য ১০০ গ্রাম বীজ নিয়ে বীজের সম্পূর্ণ আর্দ্রতা বের করে ওজন নিয়ে ৯০ গ্রাম ওজন পেলেন। এরপর অঙ্কুরোদগম ও সতেজতা পরীক্ষা করে সম্ভ্রষ্টচিত্তে গমের আবাদ করে কাঙ্ক্ষিত ফলন পান।

- ক. মাটি কাকে বলে?
- খ. FCR-এর মান যত কম খাদ্যের গুণগত মান তত ভালো ব্যাখ্যা করো।
- গ. সফিক সাহেবের পরীক্ষিত বীজের আর্দ্রতার হার নির্ণয় করো।
- ঘ. সফিক সাহেব এর বীজ পরীক্ষার কার্যক্রমটি মূল্যায়ন করো।

২. রিতা পাল মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত হয়ে নিজ পুকুরে মাছ চাষ শুরু করলেন। তিনি সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুত করে পুকুরে যথাযথভাবে প্রয়োগ করেন এবং মাছের উৎপাদন বাড়াতে সফল হন। তার সফলতা দেখে এলাকার অন্য চাষিরা নিয়মিত সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করলেন।

ক. সম্পূরক খাদ্য কাকে বলে?

খ. মাছ চাষে প্রাকৃতিক খাদ্য যথেষ্ট নয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. রিতা পালের সফলতার কারণ ব্যাখ্যা করো।

ঘ. এলাকার অন্য মাছ চাষিদের গৃহীত কার্যক্রম মূল্যায়ন করো।